

৩৫ তম বিসিএস প্রিলির সিলেবাস অনুসারে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা অংশ

সম্পাদনায়

মোজাহিদুল ইসলাম

BCS, Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com

Scanned by: Mozahidul Islam, Ctg

fb: Dream-Catcher Mozahid

My fb group: BCS Preparation (Preli, Written, Viva) + Library

প্রাথমিক আলোচনা:

ব্যাকরণ: ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়-
বি+আ+কু+অন = ব্যাকরণ।

যে শব্দে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরপের বিচার বিশ্লেষণ
করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

[বাংলা ভাষার ব্যাকরণ(নবম-দশম শ্রেণী); মূলীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হয়দার চৌধুরী]

সুতরাং, যে শব্দে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং
বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় :

প্রতিটি ভাষারই ৪টি মৌলিক অংশ থাকে- ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ। আর তাই সব ভাষার ব্যাকরণই প্রধানত
এই ৪টি অংশ নিয়েই আলোচনা করে। অর্থাৎ, ব্যাকরণের বা বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয়/ অংশ
৪টি-

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দতত্ত্ব বা ক্লপতত্ত্ব (Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এছাড়াও ব্যাকরণে আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার, ইত্যাদি।

নিচে বাংলা ব্যাকরণের এই ৪টি মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

ধ্বনি: কোন ভাষার উচ্চারণের শব্দুদ্ধিম এককই হলো সেই ভাষার ধ্বনি। ধ্বনি ভাষার মূল উপাদান।

ধ্বনিমূল: ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশকে বা একককে বলা হয় ধ্বনিমূল বা phoneme। এই ধ্বনিমূল বা
phoneme থেকেই ধ্বনিতত্ত্বের নাম হয়েছে Phonology।

বর্ণ: বিভিন্ন ধ্বনিকে লেখার সময় বা নির্দেশ করার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বর্ণ বলে।

শব্দ: একটি ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই ধ্বনি বা
ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। বাক্যের মূল উপাদান শব্দ।

ক্লপ: শব্দের শব্দুদ্ধিম অংশকে বলা হয় ক্লপ বা morpheme। ক্লপ শব্দের শব্দুদ্ধিম একক। এই ক্লপ বা
morpheme থেকেই শব্দতত্ত্বের নাম হয়েছে ক্লপতত্ত্ব বা Morphology।

বাক্য: কতোগুলো পদ সুবিন্যস্ত হয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। ভাষার মূল
উপকরণ বাক্য।

বাংলা ব্যাকরণের মূল ৪টি অংশে আলোচ্য বিষয়সমূহ:

ব্যাকরণের অংশ	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) (ধ্বনি সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	ধ্বনির উচ্চারণবিধি ধ্বনি পরিবর্তন সম্বন্ধ/ধ্বনিসংযোগ (সম্বন্ধ ধ্বনির মিলন। তাই এটি ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।) গুরু ও অগুরু বিধান
শব্দতত্ত্ব বা ক্লুপতত্ত্ব (Morphology) (শব্দ সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	সমাস (সমাস শব্দের মিলন। তাই এটি শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয়।) প্রকৃতি-প্রত্যয় (প্রকৃতি-প্রত্যয় শব্দ নিয়ে কাজ করে। মনে রাখা দরকার, প্রকৃতি মাত্রাই প্রাতিপাদিক বা ক্রিয়াপদ, অর্থাৎ স্বাধীন শব্দ।) উপসর্গ (উপসর্গ নিজে শব্দ না হলেও শব্দ ছাড়া এর কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্ত উপসর্গ নতুন শব্দ তৈরির একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ারও বটে।) বচন, ধাতু শব্দের শ্রেণীবিভাগ, পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ, দ্বিক্রৃত শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ পদার্থিত নির্দেশক
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) (বাক্য সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	পদ প্রকরণ (শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তখনই সেটাকে পদ বলে। তাই পদ বাক্যের ও পদ প্রকরণ বাক্যতত্ত্বের অন্তর্গত।) ক্রিয়াপদ কারক ও বিভক্তি (বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কারক বলে। বাক্যের অন্তর্গত পদ নিয়ে কাজ করে বলে কারকও বাক্যতত্ত্বের অন্তর্গত।) কাল, পুরুষ, অনুসর্গ, বাগধারা, বাচ্য, উক্তি যতি ও ছেদ চিহ্ন (বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে যতি বা ছেদ চিহ্ন ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, এরা বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।) বাক্যের প্রকারভেদ, বাক্যে পদ-সংস্থাপনার ক্রম বা পদক্রম
অর্থতত্ত্ব (Semantics) (অর্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়।)	শব্দের অর্থবিচার বাক্যের অর্থবিচার অর্থের প্রকারভেদ; মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ

বি. দ্র: পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে সিলেবাস ও বিগত বছরের প্রশ্ন সম্পর্কে ধারনা থাকা অতীব জনপ্রীয়। এবার আমরা দেখব সিলেবাসে কী কী অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিগত বছরে কী কী প্রশ্ন এসেছিল:

এক নজরে সিলেবাস

বিষয়ের নাম : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পূর্ণমান : ৩৫

মান বচ্টন

ভাষা :

১৫

প্রয়োগ-অপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুন্দি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ,
ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস

সাহিত্য :

০৫

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ

১৫

(খ) আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান পর্যন্ত)

০৫

সর্বমোট-

৩৫

বিগত বছরের প্রশ্ন

[সংক্ষেপে :]

- ১। “পুরুষার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার”- নিম্নরেখ শব্দ কোনটি শুন্দি, কোনটি অশুন্দি..
- ২। নিচের কোন বানানটি শুন্দি? মনিষি, মনীষী..
- ৩। কোন বাক্যটি শুন্দি? দৈন্য সর্বদা মহস্তের পরচায়ক নয়, দৈন্য সর্বদা মহস্তের পরচায়ক নয়,....
- ৪। Consumer Goods - এর উপযুক্ত পরিভাষা কোনটি? ভোগ্যপণ্য, ক্রয়কৃত পণ্য....
- ৫। ‘জল’ শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? জলধি, নীর, সলিল, উদক
- ৬। কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়? হষ্ট-পুষ্ট, অনুলোম-প্রতিলোম, গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ, নশ্বর-শ্বাস্থত
- ৭। ‘পরশ্ব’ শব্দটির অর্থ কী? পরশ্ব, পরের ধন....
- ৮। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত? ৭,৯,১১,১৩
- ৯। বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? সমাস, লিঙ্গ, উপসর্গ..
- ১০। ‘লবণ’ শব্দের বিশেষ্য কোনটি? নেনতা, লাবণ্য..
- ১১। কোনটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়? আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা, আসতি
- ১২। নিচের কোনটি প্রত্যয়সাধিত নয়? প্রলয়, খণ্ডিত, নি:শ্বাস, অনুপ্রম
- ১৩। ‘দ্বৈপায়ন’ শব্দের শুন্দি সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? দ্বীপ+অন্ট, দ্বীপ+ অয়ন..
- ১৪। ‘জজ সাহেব’ কোন সমাসের উদাহরণ? দ্বিগু, দ্বন্দ্ব.. কর্মধায়..
- ১৫। নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? প্রাতিপদিক, অপিনিহিতি

বানান ও বাক্য শুন্ধি

বাংলা বানান, প্রয়োগ-অপ্রয়োগ ও বাক্যশুন্ধি – বিসিএস বাংলা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশটি শুধু প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নয়; লিখিত পরীক্ষা, ভাইভাসহ বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া একজন পরীক্ষার্থীর লিখিত থাতায় যদি বানান ভুল বেশি থাকে, শব্দের অপ্রয়োগ ও বাক্যের অশুন্ধি অতিমাত্রায় থাকে তিনি যতই মানসম্পন্ন লেখার চেষ্টাই করুন না কেন নিশ্চয় নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তা ভয়াবহভাবে বিক্রম প্রভাব ফেলবে। ভাষার এ শুন্ধাশুন্ধি শুধু বাংলায় নয় প্রতিটি বিষয়ের (বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিকসহ সব বিষয়) ক্ষেত্রেই ভাল থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্ব ও বাংলা বানান শুন্ধরূপে জানা থাকলেই এগুলোর উত্তর প্রদান সম্ভব। বাক্যশুন্ধির জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে ভালভাবে থেয়াল রাখবেন:-

১। বানান : বাংলা বানান ও শব্দের প্রয়োগ-অপ্রয়োগ ভালভাবে জানা ব্যক্তিত বাক্যশুন্ধির চিহ্ন করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। বাক্যশুন্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সঠিক বাংলা বানান।
যেমন – অশুন্ধঃআমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। শুন্ধঃ আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না।

২। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত ক্রটি: একই বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়। পরীক্ষার প্রশ্নে সাধু রীতির বাক্য বললে সে বাক্যে কোন চলিত রীতির শব্দ থাকতে পারবে না। আবার চলিত রীতির বাক্য বললে সে বাক্যে কোন সাধু রীতির শব্দ থাকতে পারবে না।

যেমন- অশুন্ধঃ কল্পনার চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।

শুন্ধঃ কল্পনার চিঠি দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন(সাধু)।

অথবা, কল্পনার চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন(চলিত)।

৩। বাচ্যজনিত ভুল: যেমন-

অশুন্ধঃ আমি অপমান হয়েছি।

শুন্ধঃ আমি অপমানিত হয়েছি। [এখানে বিশেষণ ‘অপমানিত’ হবে]

৪। পুনরুক্তি বা বাহল্যজনিত ভুল: যেমন –

অশুন্ধঃ তিনি অথবা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করেছেন।

শুন্ধঃ তিনি অথবা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করেছেন। [অশ্রু বললে জল বলার আর দরকার নেই]

৫। লিঙ্গজনিত ভুল: যেমন-

অশুন্ধঃ অনাথিনী মেয়েটি বড়ই অসহায়।

শুন্ধঃ অনাথা মেয়েটি বড়ই অসহায়। [অনাথ এর স্ত্রীবাচক অনাথা]

৬। বিভক্তিজনিত ভুল: যেমন-

অশুন্ধঃ বালকরা খেলাধুলায় পটু।

শুন্ধঃ বালকেরা খেলাধুলায় পটু।

৭। প্রবাদ-প্রবচনজনিত ভুল: যেমন-

অশুন্ধঃ দশক্রে ঈশ্বর ভূত।

শুন্ধঃ দশক্রে ভগবান ভূত।

৮। বচনঘটিত অশুন্ধি: যেমন-

অশুন্ধ: সকল শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত ছিল।

শুন্ধ: সকল শিক্ষক /শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত ছিল।

৯। সমাসঘটিত অশুন্ধিঃযেমন-

অশুন্ধঃতিনি আকর্ষ পর্যন্ত ভোজন করলেন।

শুন্ধঃ তিনি আকর্ষ/কর্ষ পর্যন্ত ভোজন করলেন।

১০। প্রত্যয়জনিত ভুলঃযেমন-

অশুন্ধ: জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শুন্ধ: জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১। সম্মিলিত অশুন্ধিঃ যেমন-

অশুন্ধ : ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।

শুন্ধ: ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।

১২। রচনাপদ্ধতির অশুন্ধিঃ যেমন-

অশুন্ধঃতিনি আরোগ্য হয়েছেন।

শুন্ধ: তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।

১৩। বাক্যের পদক্রমজনিত অশুন্ধিঃ যেমন-

অশুন্ধ : এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।

শুন্ধ: এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

১৪। বিরাম চিহ্নজনিত অশুন্ধিঃযেমন-

অশুন্ধ: আবদুর রহমান মাথা নিচু করে বলল আমার রান্না হজুরের পছন্দ হয় নি।

শুন্ধ: আবদুর রহমান মাথা নিচু করে বলল,”আমার রান্না হজুরের পছন্দ হয় নি।”

১৫। বাক্যের অশুন্ধ প্রয়োগ : যেমন-

অশুন্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নির্বার্য।

শুন্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নির্বার /অনিবার্য।

১৬। বাক্যে সর্বনাম প্রয়োগে অসংগতি: যেমন-

অশুন্ধ: ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রী তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।

শুন্ধ: ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রী তাদের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।

১৭। বিশেষের জায়গায় বিশেষের কিংবা বিশেষের বাহ্যজনিত ভুলঃযেমন-

অশুন্ধ: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়।

শুন্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়।

১৮। যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুলঃযেমন-

অশুন্ধ: তিনি স্বন্দীক ঢাকায় থাকেন।

শুন্ধ:তিনি সন্দীক ঢাকায় থাকেন।

১৯। নয় তো/নয়তো এর ব্যবহার: যেমন-

(ক) আজ নয়, তো কাল যাব?

(খ) তুমি যেও, নয়তো মা খুব ভাববে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে ‘নয় তো’ এবং ‘নয়তো’ শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য রয়েছে। ‘নয় তো’ মানে ‘নয়’ আর নয়তো মানে ‘বিকল্পপথ’। একইভাবে ‘হয় তো’ হচ্ছে হ্যাঁ-সূচক আর ‘হয়তো’ হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

২০। না এর ব্যবহার: না সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে।

যেমন- তুমি গান না গাইলে আমি গাইব না।

না- বোধক ছাড়াও অনুরোধ অর্থে ‘না’ এর ব্যবহার: যেমন- একটি গান গাও না ভাই।

বাক্যশুল্ক -০১:

১। অশুন্দ: এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।

শুন্দ: এসব লোককে/লোকগুলোকে আমি চিনি।

ব্যাখ্যা: বাহ্য দোষ। সব এবং গুলো – দুটোই বহুবচনাত্মক শব্দ। তাই দুটো একসঙ্গে বসতে পারে না।

একাপে-

*অশুন্দ: সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।

শুন্দ: সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।

*অশুন্দ: আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।

শুন্দ: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

*অশুন্দ: ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।

শুন্দ: ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছের আকার একই রকমের।

*অশুন্দ: বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।

শুন্দ: বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

*অশুন্দ: সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শুন্দ: সকল সদস্য/সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

*অশুন্দ: বমালশুন্দ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।

শুন্দ: বমাল/মালশুন্দ চোর গ্রেপ্তার হয়েছ।

*অশুন্দ: সর্ব বিষয়সমূহে বাহ্যিক বর্জন করবে।

শুন্দ: সব বিষয়ে বাহ্যিক/বহুতা বর্জন করবে।

*অশুন্দ: সব ধনাত্য ব্যক্তিবর্গের আতিথি সৎকার করা উচিত।

শুন্দ: সব ধনাত্য ব্যক্তির আতিথি সৎকার করা উচিত।

ব্যাখ্যা: মনে রাখবেন, অতীতবাচক শব্দের শেষে ‘ত’ হয়। যেমন- অতীত, উচিত(‘উচিত’- অতীতবাচক

শব্দ)। অন্যদিকে যা আছে, চলছে, চলবে অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝালে ‘ঃ’ হয়। যেমন- জগৎ, বিদ্যুৎ, ভবিষ্যৎ

ইত্যাদি। কিন্তু এসব শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে ‘ঃ’ ক্রপান্তরিত হয়ে ‘ত’ হয়ে যায়। যেমন-

জগৎ+এ=জগতে, ভবিষ্যৎ + এর = ভবিষ্যতের।

*অশুন্দ: সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।

শুন্দ: সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। অথবা, সে ভিড়ে অন্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।

২। অশুন্দ: তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।

শুন্দ: তিনি সানন্দ/আনন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।

ব্যাখ্যা: স+আনন্দ+ইতি=সানন্দিত। ‘সানন্দিত’ একটি ভুল শব্দ। মূল শব্দ ‘আনন্দ’। এর পূর্বে ‘স’ আবার পরে ‘ইতি’ হয় না। হয়ত বলতে হবে ‘সানন্দ’ নয়ত বলতে হবে ‘আনন্দিত’। এরপ আরো কয়েকটি ভুল শব্দ – সলজ্জিত (স+লজ্জা+ইতি), সশক্তি (স+শক্তা+ইতি)।

*অশুন্দ: সশক্তি মানুষটি বুদ্ধিমত্তায় ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারণেই?

শুন্দ: শক্তি/সশক্তি মানুষটি বুদ্ধিমত্তায় ভুগিবে, ভাবছ কোন কারণে?

ব্যাখ্যা: বাক্যটির বক্তব্যকে সাজানোর কাজটিও করে নিলাম।

*অশুন্দ: সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

শুন্দ: সলজ্জা/লজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

বাক্যশুন্দি - ০২:

১। অশুন্দ: তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

শুন্দ: তোমার কটুক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

ব্যাখ্যা: কটু+উক্তি=কটুক্তি। ‘কটু’ ও ‘উক্তি’ দুটো শব্দেই ‘উ’কার থাকলেও সন্ধির ফলে ‘কটুক্তি’ শব্দে ‘উ’কার হয়। এমন আরো কয়েকটি শব্দ হল – সু+উক্তি=সুক্তি, মুরু+উদ্যান=মুরুদ্যান, বিধু+উদয়=বিধুদ্য, গুরু+উপদেশ=গুরুপদেশ, মধু+উৎসব= মধুৎসব।

বাক্যটির আরেকটি ভুল হল – সাধুরীতির শব্দ ‘শুনিয়া’ শব্দের ব্যবহার।

২। অশুন্দ : নিরপরাধী ব্যক্তিকে শ্রমা কর।

শুন্দ: নিরপরাধ ব্যক্তিকে শ্রমা কর।

ব্যাখ্যা: অপরাধী কিন্তু নিরপরাধ(নিরপরাধী নয়)।

নিরপরাধী নামে কোন শব্দ বাংলায় নেই। এরপে-

দোষী কিন্তু নির্দোষ (নির্দোষী নয়),

অহংকারী কিন্তু নিরহংকার (নিরহংকারী নয়)।

৩। অশুন্দ: অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নির্বার্য।

শুন্দ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য /দুর্নির্বার।

ব্যাখ্যা: যা কোনভাবেই নিবারণ করা যায় না=অনিবার্য। আবার, যা বহু কষ্টে নিবারণ করা যায়=দুর্নির্বার। প্রশ্নোক্ত বাক্যটি অশুন্দের কারণ বাক্যটিতে ‘দুর্নির্বার’ শব্দের ‘দুর্নি’ আর ‘অনিবার্য’ শব্দের ‘বার্য’ মিলিয়ে থিছুড়ি শব্দ ‘দুর্নির্বার্য’ বানানো হয়েছে।

৪। অশুন্দ: ইদানীং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।

শুন্দ : ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।

ব্যাখ্যা: ‘ইদানীং’ শব্দের মধ্যেই কাল বা সময় লুকিয়ে আছে। তাই ‘ইদানীং’ শব্দের সঙ্গে ‘কাল’ শব্দের ব্যবহার শব্দের অপপ্রয়োগ। এরপে-

* অশুন্দ: পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কথা বলা অনুচিত।

শুন্দ: পরীক্ষা চলাকালে/চলার সময়ে কথা বলা অনুচিত।

ব্যাখ্যা: চলা +কালীন +সময়। কাল ও সময় এক সঙ্গে হতে পারে না।

৫। অশুন্দ: মনের কালি দূর করতে কালিমন্দিরে যাওয়া দরকার।

শুন্দ: মনের কালি দূর করতে কালীমন্দিরে যাওয়া দরকার।

ব্যাখ্যা: 'কালী' শব্দের সঙ্গে মন্দির, পূজা, বাড়ি, ঘাট, চরণ, পদ ও প্রসন্ন যুক্ত হলে 'ঈ'কার হয়। অর্থাৎ কালীমন্দির, কালীপূজা, কালীবাড়ি, কালীঘাট, কালীচরণ, কালীপদ, কালীপ্রসন্ন। কিন্তু রং অর্থ প্রকাশে 'কালি' বানান 'ই'কার হয়। যেমন- মনের কালি, পাতিলের কালি, কলমের কালি।

মহাকবি কালিদাসের বানানেও 'ই'কার হয়।

৬। অশুদ্ধ: তিনি স্বত্ত্বাক স্টেশনে গিয়েছেন।

শুদ্ধ: তিনি স্বত্ত্বাক স্টেশনে গিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: স = সহ, স্ব = নিজ। তিনি স্বত্ত্বাক (স্ত্রীসহ) গিয়েছেন, এর মানেই হল তিনি নিজের স্ত্রী নিয়েই গিয়েছেন (অন্যের স্ত্রী নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না)।

এরপে-

*অশুদ্ধ: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

শুদ্ধ: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

বাক্যশুদ্ধি -০৩ :

১। অশুদ্ধ: লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।

শুদ্ধ: লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।

ব্যাখ্যা: 'মনোযোগ' (মনঃ+যোগ) শব্দটি সন্ধিসাধিত শব্দ। মনে রাখবেন, ঃঃ (বিসর্গ) সন্ধির ক্ষেত্রে বিসর্গের পরে যদি ঘোষ ধ্বনি (বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম), হ, য, ব, র ও ল থাকে সেক্ষেত্রে বিসর্গের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে 'ও'কার যুক্ত হয়। এরপে-

যশঃ+লাভ=যশোলাভ,

ইতিঃ+মধ্যে=ইতোমধ্যে,

মনঃ+রম=মনোরম,

মনঃ+হর=মনোহর,

অধঃ+গতি=অধোগতি,

মনঃ+নয়ন=মনোনয়ন।

২। অশুদ্ধ: সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।

শুদ্ধ: সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ/শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।

ব্যাখ্যা: শব্দের শেষে 'তম' প্রত্যয় সবচেয়ে অর্থেই (ইংরেজি superlative) ব্যবহৃত হয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে 'তর' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-

*পদ্মা বাংলাদেশের দীর্ঘ নদী।

*পদ্মা যমুনা অপেক্ষা দীর্ঘতর (পদ্মা আর যমুনা – এ দুয়ের পার্থক্য বুঝানো হয়েছে।

*পদ্মা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী/পদ্মা বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী (বাংলাদেশের সব নদীর মধ্যে বুঝাতে)।

৩। অশুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।

শুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।

ব্যাখ্যা: 'অপমান' বিশেষ পদ যার অর্থ অসম্মান কিন্তু 'অপমানিত' বিশেষণ পদ যার অর্থ অসম্মানিত। তাহলে চিন্তা করুন তো আপনি কি এভাবে কথনো বলবেন?

*আপনি অসম্মান হবেন। নাকি বলবেন- *আপনি অসম্মানিত হবেন।

এ ধরনের ভুলকে রচনারীতির অশুদ্ধি বলে। এরপে-

*অশুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।

শুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।

*অশুদ্ধ: অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।

শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়।

ব্যাখ্যা: কৌতুক কিন্তু কৌতুহল, অনুবাদ কিন্তু অনুদিত।

৪। অশুদ্ধ: ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। শুদ্ধ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।

৫। অশুন্ধ: উপরোক্ত।

শুন্ধ: উপর্যুক্ত।

৬। অশুন্ধ : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।
ব্যাখ্যা: অনলে কেউ মগ্ন হয় না, দক্ষ হয়।

শুন্ধ: মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দক্ষ।

৭। অশুন্ধ:আজকাল অনেকেই ফুল বানান ভুল করে। শুন্ধ: আজকাল অনেকেই ফুল বানান ভুল করে।

বাক্যশুন্ধি -০৪:

১। অশুন্ধ: বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।
ব্যাখ্যা: বিবাদ কিন্তু বিবদমান।

শুন্ধ: বিবদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।

২। অশুন্ধ: অসহনীয় ব্যথা।

শুন্ধ: অসহনীয় ব্যথা /অসহ ব্যথা।

৩। অশুন্ধ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

শুন্ধ: মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

ব্যাখ্যা: কোন গৃহে সভা হয় না,কক্ষে সভা হয়।

৪। অশুন্ধ: তিনিও আদালতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।

শুন্ধ: তিনিও আদালতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।

ব্যাখ্যা: সাক্ষী হলেন ব্যক্তিবাচক শব্দ।সাক্ষ্য হল জবানবন্দি। আদালতে কেউ সাক্ষী দেয় না,জবানবন্দি(সাক্ষ্য) দেয়।

৫। অশুন্ধ:বিস্ময়াভিভুত হতবাক চিত।শুন্ধ: বিস্ময়াভিভুত চিত/হতবাক চিত।

৬। অশুন্ধ: সংবাদ সম্মেলন। শুন্ধ: সাংবাদিক সম্মেলন।

৭। অশুন্ধ: স্বাক্ষরতা কর্মসূচী। শুন্ধ: সাক্ষরতা কর্মসূচী।

৮। অশুন্ধ: গড়ালিকাপ্রবাহ। শুন্ধ: গড়ালিকাপ্রবাহ।

৯। অশুন্ধ: স্বশরীর। শুন্ধ: সশরীর।

১০। অশুন্ধ: শশীভূষণ। শুন্ধ: শশীভূষণ [শশী কিন্তু ‘শশী’শব্দের সাথে ‘ভূষণ’ যুক্ত হলে শশিভূষণ]

১১। অশুন্ধ: দোষনীয়। শুন্ধ: দূষণীয়।

১২। অশুন্ধ: হৃদকম্প। শুন্ধ: হৎকম্প।

১৩। অশুন্ধ: প্রিক্যতান। শুন্ধ: প্রিকতান।

১৪। অশুন্ধ: সশিক্ষিত। শুন্ধ: স্বশিক্ষিত।

১৫। অশুন্ধ: ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না। শুন্ধ: ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না।

১৬। অশুন্ধ: স্বার্থকতা। শুন্ধ: সার্থকতা। কিন্তু স্বার্থপরতা বানানে ‘ব’ফলা হবে।

১৭। অশুন্ধ :অনাথিনী। শুন্ধ: অনাথা।

১৮। অশুন্ধ:এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা। শুন্ধ: এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।

ক্রমবাচক সংখ্যা হিসেবে ‘ষষ্ঠদশ’ ভুল শব্দ।যেমন- একাদশ,দ্বাদশ,ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ,ষোড়শ.....

১৯। অশুন্ধ: অন্তরের অন্তস্থল। শুন্ধ: অন্তরের অন্তঃস্থল।

২০। অশুন্ধ:অনুর্ধ্বানে আপনি স্ববাল্বে আমন্ত্রিত। শুন্ধ: অনুর্ধ্বানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

২১। অশুন্ধ: ভূমিকম্পে উর্ধ্বর্মুখী দালানটি ধসে পড়ল। শুন্ধ: ভূমিকম্পে উর্ধ্বর্মুখী দালানটি ধসে পড়ল।

২৩। অশুদ্ধঃ সমৃদ্ধশালী। শুদ্ধঃ সমৃদ্ধ বা সমৃদ্ধিশালী।

২৫। অশুদ্ধ : আমি সন্তোষ হলাম শুদ্ধ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।

২৬। অশুদ্ধ : বিদ্বান নারী। শুদ্ধ: বিদ্যুষী নারী।

বাক্যগুরু ০-৫

শুন্ধ: পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।

শুন্ধ: পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।

অশুন্ধ: গীতাঞ্জলী পড়েছ কি?

শুন্ধ: 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি?

ଅଶ୍ଵନ୍ଧ: ନଦୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ହେଯିଛେ।

শুন্ধ: নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।

ଅଶ୍ଵନ୍ଧ: ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ହେଯେଛେ।

ଶୁଦ୍ଧ: ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବେଳେ ।

অশুল্ক: আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।

শুন্দ: আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যিকতা নেই।

ଅଶ୍ଵଦ୍ଧ: ତୋମାର ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଯୋଗ୍ୟ ନୟ ।

শুন্ধ: তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

অশুঙ্ক: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।

শুন্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

অশুন্ধ: তিনি স্বন্দৰিক বেড়াতে গেছেন।

শুন্ধ: তিনি সন্তোষ বেড়াতে গেছেন।

ଅଶୁଦ୍ଧ: ଇହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାଇ।

শুন্ধি: ইহার আবশ্যকতা নাই।

ଅଶ୍ରୁ: ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟାପାରେ କୌତୁଳ ଭାଲ ନୟ।

ଶୁଦ୍ଧ: ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାପାରେ କୌତୁଳ ଭାଲ ନୟ।

অশুন্দ: সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শুন্দ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অশুন্দ: সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।

শুন্দ: সমৃদ্ধিশালী / সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

অশুন্দ: আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।

শুন্দ: এ কাজে আমার সহযোগিতা নেই।

অশুন্দ: দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।

শুন্দ: দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

অশুন্দ: এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।

শুন্দ: এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

অশুন্দ: তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।

শুন্দ: তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।

অশুন্দ: উপরোক্ত বাক্যটি শুন্দ নয়।

শুন্দ: উপর্যুক্ত বাক্যটি শুন্দ নয়।

অশুন্দ: সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।

শুন্দ: সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্য / অনুগত ছাত্র।

অশুন্দ: তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।

শুন্দ: তারা বাড়ি যাচ্ছে।

অশুন্দ: অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।

শুন্দ: অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।

অশুন্দ: অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।

শুন্দ: অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।

অশুন্দ: অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।

শুন্দ: অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।

অশুন্দ: অতিলোভে তাতী নষ্ট।

শুন্দ: অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

অশুন্দ: অতিশয় দুঃখিত হলাম।

শুন্দ: খুব দুঃখ পেলাম / অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

অশুন্দ: আমি সন্তোষ হলাম।

শুন্দ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।

অশুন্দ: গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।

শুন্দ: 'গীতাঞ্জলি' একখানা কাব্য গ্রন্থ।

অশুন্দ: পরোপকার মানুষস্বের পরিচায়ক।

শুন্দ: পরোপকার মনুষ্যস্বের পরিচায়ক।

অশুন্দ: বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।

শুন্দ: বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়।

অশুন্দ: বিদ্যানকে সকলে শুন্দা করে।

শুন্দ: বিদ্বানকে সকলে শুন্দা করে।

অশুন্দ: মেয়েটি বিদ্যান কিঞ্চ ঝগড়াটো।

শুন্দ: মেয়েটি বিদুষী কিঞ্চ ঝগড়াটো।

অশুন্দ: যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।

শুন্দ: যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।

অশুন্দ: রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।

শুন্দ: রচনাটির উৎকর্ষ (বা উৎকৃষ্টতা) অনস্বীকার্য।

অশুন্দ: মাদকাশক্তি ভাল নয়।

শুন্দ: মাদকাসক্তি ভাল নয়।

অশুন্দ: সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।

শুন্দ: সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।

অশুন্দ: তুমিই টাকাটি আস্বাস্ম্যাং করেছ।

শুন্দ: তুমিই টাকাগুলি আস্বাস্মাং করেছ।

অশুন্দ: বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।

শুন্দ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

অশুন্দ: অন্যায়ের ফল দুর্বিবার্য।

শুন্দ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।

অশুন্দ: সে অপমান হইয়াছে।

শুন্দ: সে অপমানিত হইয়াছে।

অশুন্দ: উৎপন্ন বৃক্ষির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

শুন্দ: উৎপাদন বৃক্ষির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

অশুন্দ: কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?

শুন্দ: কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?

অশুন্দ: আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।

শুন্দ: আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।

অশুন্দ: একের লাঠি দশের বোঝা।

শুন্দ: দশের লাঠি একের বোঝা।

অশুন্দ: সব মাছগুলোর দাম কত?

শুন্দ: সব মাছের দাম কত?

অশুন্দ: কালীদাস খ্যাতমান কবি।

শুন্দ: কালীদাস বিখ্যাত কবি।

অশুন্দ: তাহাকে এখান থেকে যাইতে হইবে।

শুন্দ: তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

অশুন্দ: বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাদিত হয়েছে।

শুন্দ: বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাদিত হয়েছে।

অশুন্দ: বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।

শুন্দ: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।

অশুন্দ: সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।

শুন্দ: সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।

অশুন্দ: আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা করা উচিত নয়।

শুন্দ: আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্য উচিত নয়।

অশুন্দ: এটা লজ্জাক্ষর ব্যাপার।

শুন্দ: এটা লজ্জাক্ষর ব্যাপার।

অশুন্দ: অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।

শুন্দ: অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।

অশুন্দ: তার সৌজন্যতায় মুন্দ হয়েছি।

শুন্দ: তার সৌজন্যে মুন্দ হয়েছি।

অশুন্দ: সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।

শুন্দ: সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।

অশুন্দ: তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই।

শুন্দ: তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই।

অশুন্দ: এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।

শুন্দ: এক মাঘে শীত যায় না।

অশুদ্ধ: মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

শুন্দ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

অশুদ্ধ: আমি এই ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শুন্দ: আমি এই ঘটনা চাক্ষুস দেখিয়াছি।

অশুদ্ধ: সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র, ঘোড়াগুলি বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

শুন্দ: সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

অশুদ্ধ: কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

শুন্দ: কন্যার বাপ সবুর করিতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

অশুদ্ধ: দরিদ্রের কথা বাসি হলে ফলে।

শুন্দ: কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে।

অশুদ্ধ: বৃক্ষে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

শুন্দ: গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

অশুদ্ধ: চোরে চোরে মামাত ভাই।

শুন্দ: চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

অশুদ্ধ: টেঁকি বেহেস্তে গেলেও ধান ভানে।

শুন্দ: টেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

অশুদ্ধ: হাটে কলস ভাঙা।

শুন্দ: হাটে হাঁড়ি ভাঙা।

অশুদ্ধ: যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা।

শুন্দ: যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

অশুদ্ধ: ভাত ধ্বংস করা।

শুন্দ: অন্ধ ধ্বংস করা।

অশুদ্ধ: সাবধানপূর্বক চলবে।

শুন্দ: সাবধানে চলবে।

অশুদ্ধ: অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হবেন।

শুন্দ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন।

অশুদ্ধ: সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী।

শুন্দ: সকল ছাত্রই লেখাপড়ায় / পাঠে অমনোযোগী।

বানান শব্দিক:

বানান শব্দিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি।

বানান শব্দিক-১: বাংলা একাডেমির বানানের নিয়ম [শিখা উচিত]

বানান শব্দিক-২: গ-স্ব বিধান ও ষ-স্ব বিধান [শিখা উচিত]

বানান শব্দিক-৩: কতিপয় বাংলা শব্দের শুন্ধকরণ [১, ২ না পড়লেও এইটা অবশ্যই শিখা উচিত]

বানান শব্দিক-৪: অন্যান্য [উপরের গুলো যদি পারেন বা শিখা হয়ে যায়, তবে এটি পড়ুন]

বানান শব্দিক-১: প্রথমেই আমাদের বাংলা একাডেমির বানানের নিয়ম ভালভাবে জেনে নেয়া দরকার। নিচে নিয়মগুলো তুলে ধরছি-

তৎসম শব্দ

১.০১. তৎসম অর্থাং বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১.০২. তবে যেসব তৎসম শব্দে ইঁ বা উ উ উভয় শুন্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কার চিহ্ন ই-কার উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, থঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঙ্কি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঙ্গরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

১.০৩. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় হবে না। যেমন : অঁচনা, অঁর্জন, অৰ্থ, অৰ্ধ, কৰ্দম, কৰ্তন, কৰ্ম, কাৰ্য, গৰ্জন, মূৰ্ছা, কাৰ্তিক, বার্ধক্য, বাৰ্তা, সূৰ্য।

১.০৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তিম ম স্থানে অনুস্থান (ংং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভযংকর, সংগীত, শুভংকর, হস্যংগম, সংঘটন। তবে অঞ্চ, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ও স্থানে ংং হবে না।

অ-তৎসম অর্থাং তন্ত্ব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

২.০১. ই ইঁ উ উ

সকল অ-তৎসম অর্থাং তন্ত্ব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন পিঁ দু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারাসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিঙ্গারি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাথি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচু, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্পিশ।

অনুন্নপভাবে— আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঝি-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন : রানী, পরী, গান্ডী।

সর্বনাম পদক্রমে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদক্রমে কী শব্দটি ঝি-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : কী কৱছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী আৱ বলৰ? কী জানি? কী যে কৱি! তোমাৱ কী। এটা কী বই? কী কৱে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ! কী দুৱাশা!

অন্য ক্ষেত্রে অবয় পদক্রমে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদশী।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

২.০২. ক্ষেত্র

ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত্র শব্দ থির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে, ইত্যাদি লেখা হবে।

২.০৩. মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুন্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া তন্ত্র, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ষষ্ঠি-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুন্তি, গোনা, ঝুরনা, ধুরন, পুরান, সোনা, হৰ্ণ।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্য বর্ণ ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুর্ণন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে। ৪.০১ দ্রষ্টব্য।

২.০৪. শ, ষ, স

তৎসম শব্দে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষষ্ঠি-বিধি প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশী মূল শব্দে শ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (=বৎসর), সন, হিমাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলো, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দৃষ্টি, নির্ষ্টা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

কিন্তু শ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্মিকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্টি ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে শ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

২.০৫. আরবি-ফারাসি শব্দে 'সে', 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলির প্রতিবর্ণনাপে স, এবং 'শিন'-এর প্রতিবর্ণনাপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন ; সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশত। এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ।

২.০৬. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

২.০৭. জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, ছকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে', 'যাল', 'যোয়াদ', 'যোই' রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন : আযান, এয়িন, ওয়ু, কায়া, নামায, মুয়ায় শিন, যোহর, রময়ান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন। জাদু, জোয়াল, জো, ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

২.০৮. এ, অ্য

বাংলায় এ বা এ-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পত্ত হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখা নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা এ-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।

বিদেশী শব্দ অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা এ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড (end), নেট, বেড, শেড।

বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা অ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যান্ড (and), অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট।

তবে কিছু তদ্ব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার অ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠ্য। এসব শব্দে অ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

২.০৯. ৩

বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ও-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য), ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া অনুরূপ ও-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

২.১০. ০ং, ঙ

তৎসম শব্দে ০ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহৃত ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ-সম্পর্কে পূর্বে ১.০৪ অনুচ্ছেদে কিছু নিয়মের কথা বলা হয়েছে। তদ্ব দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্থান (০ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ০ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

২.১১. রেফ ও দ্বিত্ব

তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

২.১২. বিসর্গ

শব্দের শেষে বিসর্গ (ং) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ।

পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসম্বন্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুষ্ট, নিষ্পৃহ।

২.১৩. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

২.১৪. বিদেশী শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশেষ সম্ভবই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিন্ট, স্পিং। তবে কিছু কিছু বিশেষ করা যায়। যেমন : সেপটেন্টের, অকটোবর, মার্ক্স, শেক্সপিয়র, ইস্রাফিল।

২.১৫. হস্তিক

হস্তিক যথাসন্তুষ্ট বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শথ, টাক, টক।

তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্তিক ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ, যাহ।

যদি অর্থের বিপ্রাণ্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্তিক ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর, ধর, মর, বল।

২.১৬. উর্ধ্ব-কমা

উর্ধ্ব-কমা যথাসন্তুষ্ট বর্জন করা হবে। যেমন : করল (=করিল), ধরত, বলে (=বলিয়া), হয়ে, দুজন, চার শ, চাল (চাউল), আল (=আইল)।

বিবিধ

৩.০১. যুক্ত-ব্যঙ্গনবর্ণগুলি যতদূর সন্তুষ্ট স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণন নিচে বসাতে হবে।

তবে ক্ষ, জ্ঞ, ঝ, ঝু, ভ্ৰ, হ্—এইসব ক্ষেত্রে পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। কেননা তা বিশিষ্ট করলে উচ্চারণবিকৃতির সন্তান থাকে।

৩.০২. সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন : সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিতি, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যপ্রস্তুত, বারবার, বিশাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সংকল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কথনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩.০৩. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন : সুনীল আকাশ, সুন্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ ফুল, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের ওগ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা-বরন মেয়ে। তবে কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন : দুজন।

৩.০৪. নাই, নেই, না, নি এই নঞ্চর্থক অব্যয় পদগুলি শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন : বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নাই, আমার ভয় নেই।

তবে শব্দের পূর্বে নঞ্চর্থক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নারাজ, নাবালক, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-বলা বাণী, না-শোনা কথা, না-গোনা পাথি।

৩.০৫. উদ্ভৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোন পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ভৃত করতে হবে। যদি উদ্ভৃত রচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ক্রটি থাকে, ভুলই উদ্ভৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুন্দ বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই উর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ভৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। তবে উদ্ভৃত অংশকে যদি ইনসেট করা হয় তাহলে উর্ধ্ব-কমার চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে না। তাছাড়া কবিতা যদি মূল চরণ-বিন্যাস অনুযায়ী উদ্ভৃত হয় এবং কবির নামের উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রেও উদ্ভৃতি-চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। ইনসেট না হলে গদ্যের উদ্ভৃতিতে প্রথমে ও শেষে উদ্ভৃতি-চিহ্ন দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ভৃতি-চিহ্ন দিতে হবে। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে উদ্ভৃত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেওয়া হয় অর্থাৎ উদ্ভৃত করা না হয়, বাদ দেওয়ার

স্থানগুলিকে তিনটি বিন্দু বা ডট (অবলোপ চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। গোটা অনুচ্ছেদ, স্ববক বা একাধিক ছত্রের কোনো বৃহৎ অংশ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি তারকার দ্বারা একটি ছত্র রচনা করে ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। কোনো পুরাতন অভিযোজিত বা সংক্ষেপিত পার্থে অবশ্য পুরাতন বানানকে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

৪.০১ গুরু-বিধি সম্পর্কে দুই মত

অ-তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের বানানের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারেন নি। একটি মতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে নট ষ্ট ও ট হবে। যথা : ঘন্টা, লর্ণন, ওণ্ডা। অন্যমতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে নট ষ্ট ন্ট হবে। যথা : ঘন্টা, প্যান্ট, প্রেসিডেন্ট, লর্ণন, ওণ্ডা, পান্ডা, ব্যান্ড, লন্ডভন্ড।

গুরু ও শব্দ বিধান:

গুরু ও শব্দ বিধান : থাঁটি বাংলা শব্দে বা তত্ত্ব শব্দে কথনোই ‘ণ/ ষ’ ব্যবহৃত হয় না। শুধু তাই না, অর্ধ-তৎসম, দেশি বা বিদেশি শব্দেও ‘ণ/ষ’ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন পরিবর্তন ছাড়াই সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে, সে সব শব্দে সংস্কৃত ভাষার বানান অনুসরণ করার জন্য ‘ণ/ ষ’ ব্যবহার করতে হয়।

এইসব তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ‘ণ/ ষ’ ব্যবহার করার নিয়মকেই বলা হয় গুরু ও শব্দ বিধান।

ণ-বিধান বা ণ ব্যবহারের নিয়ম:

১.ট-বগীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ণ) আগে ন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হলে তা সব সময় ‘ণ’ হয়।
যেমন- **কৰ্ণ**, **ঘন্টা**, **লর্ণন**, **কাণ** , ইত্যাদি।

২. ঝ, র, ষ- এদের পরে ‘ণ’ হয়।

যেমন- **ঝণ**, **তৃণ** (ত+ঝ+ণ+অ), **বণ** (ব+অ+ঝ+ণ+অ), **বৰ্ণনা**, **কাৰণ**, **মৱণ**, **ভীষণ**, **ভাৰণ**,
উষ্ণ (উ+ষ+ণ)।

৩. ঝ, র, ষ- এদের পরে স্বর.কপ.যব.হং* থাকলে এবং তারপর ‘ন’ আসলে তা ‘ণ’ হয়।

[*এখানে স্বরকপযবহং =স্বর = স্বরধ্বনি, কপ = ক ও প বগীয় ধ্বনি, যব = ষ, য়, য, ব, হং = হ, ঙ]

যেমন-**কৃপণ** (ক+ঝ+ প (প-বগীয় ধ্বনি)+অ (স্বরধ্বনি) + ণ)

হৱিণ (হ+অ+র+ ই(স্বরধ্বনি) + ণ)

অৰ্পণ (অ+র+ প(প-বগীয় ধ্বনি)+অ (স্বরধ্বনি) + ণ)

লক্ষণ (ল+অ+ক+ষ+ অ(স্বরধ্বনি) + ণ)

রামাযণ (র+ আ(স্বরধ্বনি+ম(প-বগীয় ধ্বনি)+আ(স্বরধ্বনি) +য(যব) + ণ)

কলঞ্চী (র+ উ(স্বরধ্বনি)+ক(ক-বগীয়ধ্বনি)+ম(প-বগীয়ধ্বনি) +ই(স্বরধ্বনি) + ণ +ই)

ব্রাহ্মণ (ব+র+ আ(স্বরধ্বনি)+হ(হং)+ম(প-বগীয় ধ্বনি)+অ(স্বরধ্বনি) + ণ)

৪. কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়- [কবিতার মত মুখস্ত করুন]

চাণক্য মাণিক্য গণ **বাণিজ্য লবণ মণ**

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা

কল্যাণ শোণিত মণি **স্বাণু শুণ পুণ্য বেণী**

ফণী অণু বিপণি গণিকা

আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গোণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিঙ্গ নিঙ্গ তুণ কফোণি বণিক ঔণ
গণণা পিণাক পণ্য বাণ

৫. (এটি নম্ব বিধানের সংজ্ঞানুযায়ী নম্ব বিধানের নিয়ম নয়) সমাসবদ্ধ শব্দে নম্ব বিধান থাটে না। অর্থাৎ, সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দে ‘ন’ হয় না, ‘ন’ হয়। যেমন- **ত্রিনয়ন** (২নং নিয়ম অনুযায়ী ত্রিগ্রাম হওয়ার কথা), **সর্বনাম** (৩নং নিয়ম অনুযায়ী সর্বনাম), **দুর্গীতি**, **দুর্গাম**, **দুর্নির্বার**, **পরনিন্দা**, **অগ্রনায়ক**।

৬. (এটিও নম্ব বিধানের সংজ্ঞানুযায়ী নম্ব বিধানের নিয়ম নয়) ত-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হলে কথনোই ‘ন’, ‘ণ’ হয় না। অর্থাৎ, ত, থ, দ, ধ, ন- এদের সঙ্গে যুক্ত হলে সেটা ‘ন’ হবে। যেমন- **অন্ত**, **গন্ত**, **ক্রন্দন**, **চন্দন**।

ষ-ন্ম বিধান বা ‘ষ’ ব্যবহারের নিয়ম:

১. অ/আ ছাড়া অন্য স্বরক্ষনি এবং ক,র-এর পরের ‘স’, ‘ষ’ হয়।

অর্থাৎ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঝ, এ, ট্রি, ও, ও়, ক, র- এদের পরে স থাকলে তা ষ হয়।

যেমন- **ভবিষ্যৎ** (ভ+অ+ব+ই+ষ+য+ত), **মুমূর্ষু** (ম+উ+ম+উ+ৱ+ষ+উ),
চক্ষুঘ্নান (চ+অ+ক+ষ+উ+ষ+ম+আ+ন), **চিকীর্ষা** (চ+ই+ক+ঈ+ৱ+ষ+আ)

২. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে প্রায়ই ষ হয়।

অর্থাৎ, যে সব সংস্কৃত উপসর্গের শেষে ই-কার বা উ-কার আছে, সেসব উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে প্রায়ই ষ হয়।

যেমন- **অভিসেক** (এখানে উপসর্গ অভি, অ+ভ+ই- ই-কারান্ত উপসর্গ)।

এরকম- **সুষুপ্ত**, **অনুষঙ্গ**, **প্রতিষেধক**, **প্রতিষ্ঠান**, **অনুষ্ঠান**, **বিষম**, **সুষমা**।

৩. ঝ ও র-এর পরে ষ হয়। যেমন- **ঝষি**, **কৃষক** (ক+ঝ+ষ+অ+ক), **বৰ্ষা** (ব+অ+ৱ+ষ+আ),

এরকম- **উৎকৃষ্ট**, **বৃষ্টি**, **দৃষ্টা**, **কৃষ্টি**, **সৃষ্টি**, **বৰ্ষণ**।

৪. ট ও ঠ-র সঙ্গে যুক্ত হলে ষ হয়। যেমন- **কষ্ট**, **স্পষ্ট**, **নষ্ট**, **কাৰ্ষ**, **ওষ্ঠ**।

৫. কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ষ হয়। মনে রাখার সুবিধার্থে আমার একটি কবিতা শেয়ার করছি:

পাষণ্ড মানুষের পাষাণ ভাষা

বোষ কোষ পৌষ ইষৎ ইষ্বা

ষোড়শ ভূষণ তার শোষণ তোষণ

ষণ্ণ ভাষ্য আৱ ঔষধ পোষণ

দ্বেষ কলুষতার উষ্বর আভাষ

ষড়যন্ত্র, ষটচক্রের সরিষা অভিলাষ

৬. বিদেশি শব্দে কথনোই ‘ষ’ হয় না।

যেমন- **জিনিস**, **পোশাক**, **মাস্টার**, **পোস্ট**, **ইত্যাদি**।

৭. সংস্কৃত ‘সাং’ প্রতয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দেও ‘ষ’ হয় না।

যেমন- অঞ্চিসাং, ধূলিসাং, ভূমিসাং ইত্যাদি।

কতিপয় বাংলা বাগানের শব্দ নিয়ম:

বাগান শব্দি-০১:

অশুল্ক	শব্দ	অশুল্ক	শব্দ	অশুল্ক	শব্দ
কৃতিবাস	কৃতিবাস	দুষ্টি	দূষ্টি	ভূবনভূলানো	ভূবনভূলানো
অধ্যাবসায়	অধ্যাবসায়	শংখলা	শংখলা	মুহুর্মুহ	মুহুর্মুহ
সূচীপত্র	সূচীপত্র	উচ্ছুল/উশ্ছুল	উচ্ছুল	কুজ্জিকা	কুজ্জাটিকা
গ্রামীন	গ্রামীণ	শ্রদ্ধাঙ্গলী	শ্রদ্ধাঙ্গলি	কলংকিত	কলংকিত
প্রনয়ন	প্রণয়ন	শিরোচ্ছেদ	শিরুচ্ছেদ	শংখল	শংখল
মনিষি	মনীষী	মনোপূত	মনঃপূত	ইংগিত	ইঙ্গিত
সন্যাসী	সন্ধ্যাসী	বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী	পানিনি	পাণিনি
শাস্ত্রনা	সাস্ত্রনা	মুহূর্ত	মুহূর্ত	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
পিপিলিকা	পিপীলিকা	সম্বলিত	সংবলিত	মন্ত্রীষ্ঠ	মন্ত্রিষ্ঠ
বিভিষিকা	বিভীষিকা	প্রতিবিন্দীতা	প্রতিবিন্দিতা	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
শারিরিক	শারীরিক	ছাত্রছাত্রীগণ	ছাত্রছাত্রী	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
ইদৃশ	ঈদৃশ	গীতাঙ্গলী	গীতাঙ্গলি	মন্ত্রিসভা	মন্ত্রিসভা
দৈন্যতা	দৈন্য / দীনতা	শীকার	শিকার	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
কৃক্ষুতা	কৃক্ষ	অতিথী	অতিথি	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	পোষ্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার	মনমোহন	মনোমোহন
ঐক্যতান	ঐক্যতান	বিদুষি	বিদুষী	ব্যয়	ব্যয়
স্নেহশীষ	স্নেহশিস	সূক্ষ	সূক্ষ্ম	অপরাহ্ন	অপরাহ্ন
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট	আঙুল	আঙুল	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
মুখস্ত	মুখস্ত	অত্যান্ত	অত্যন্ত	সুপারিস	সুপারিশ
সমীচীন	সমীচীন	রামায়ন	রামায়ণ	আশার	আষাঢ়
শুশ্রা	শুশ্রা	প্রোজ্জলন	প্রোজ্জল/প্রভ্বলন	সম্প্রিহন	সম্প্রিহন
নূপুর	নূপুর	পরজীবি	পরজীবী	মূমৰ্শ	মূমৰ্শ
স্বত্ত্বাক	সত্ত্বাক	শশ্মান	শশান	দারিদ্রিতা	দরিদ্রতা / দারিদ্র্য
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	কৃক্ষুতাসাধন	কৃক্ষুসাধন	স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা
সুর্ত	সুর্তু	ভূবন	ভূবন	প্রসংগ	প্রসঙ্গ
কৌতুহল	কৌতুহল	মনকষ্ট	মনঃকষ্ট	উর্ধ	উর্ধ্ব
ব্যাতিত	ব্যতীত	ভাতুস্পত্র	ভ্রাতুস্পুত্র	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
নূন্যতম	নৃন্যতম	সহযোগীতা	সহযোগিতা	মনযোগ	মনোযোগ
শম্য	শস্য	শংকা	শঙ্কা	আইনজীবি	আইনজীবী
মনীচীকা	মনীচিকা	দ্বন্দ্ব	দ্বন্দ্ব	কার্য্যালয়	কার্য্যালয়
লজ্জাঙ্কর	লজ্জাকর	আস্ত্রস্ত	আস্ত্রস্ত	বিদ্যান	বিদ্বান
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	ডাষ্টবিন	ডাষ্টবিন	মধ্যাঙ্ক	মধ্যাঙ্ক

সম্বাদ	সংবাদ	দুরাবস্থা	দুরবস্থা	কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু
উচ্চাস	উচ্চাস	উচ্জল	উচ্জল		

বাচান শব্দ-০২: আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, জীবিকা । প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা, সহযোগী, সহযোগিতা, উপকারী, উপকারিতা, । প্রাণী, প্রাণিজগত, প্রাণিকুল, প্রাণিবিদ্যা, । মন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ,। আমলকী, হৰীতকী, ভাগীরথী, । সমীচীন, পিপীলিকা, বিভীষিকা, শারীরিক, আশীর্বাদ, । দূর, দূরত্ব, দূরীতি, দুর্বার, দুর্বিবার, । ধরন, ধারণ, ধারণা, কারণ, করণ, করণ, দরুন, দারুণ, হারুন। পরিবহণ, প্রাঙ্গণ, ক্লপায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ । সরণি, সারণি, শ্রেণি/শ্রেণী, ধরণি, । সূচিপত্র । শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি । ক্লপা, ক্লপালি, সোনালি, পুরালি, বর্ণালি । সরকারি, দরকারি, তরকারি, তৈরি, বৈরী । নামী, দামী, নীচমন, নিচতলা । আশিস, শুভাশিস, স্লেহাশিস | মুমুর্শু | মুহূর্ত, শুক্রবা

। মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক, চিহ্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন । দরিদ্র, দরিদ্রতা, দারিদ্র্য, দীনতা, দৈন্য । বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, জের্ত, জ্যৈষ্ঠ, । ন্যূনতম, বৃহৎ । সথ্য, জবাবদিহি, উত্কর্ষ । ব্যবচ্ছেদ, সতীচ্ছেদ, শিরচ্ছেদ । অঙ্ক, শৃঙ্গাল, আকাঞ্চ্ছা । উচিত, হঠাত । ভূত, অভূত, উভূত । পোশাক, জিনিস, শাদা/সাদা, হিশেব/ হিসেব । কাজি, গাজি, রাজি, নবি, শহিদ, শহিদমিনার । বেশি, ছব্বিশী, দেশী, বিদেশী । মুনশি, মুনশিগঞ্জ, শবজি । ইমান, বেইমান, বেইমানি । জি (হ্যাঁ), নবিজি, কবিজি, নেতাজি, গুরুজি, সাঁইজি । শরিয়া, শরিয়ত, হজ, হাজি, হজরত কোরান, কোরান শরিফ । ইংরেজি, ইরানি, জাপানি, ফারাসি, ফরাসি, এশিয়ান, এশীয়, ভারতীয়, নিউ ইয়র্ক, নিউ ক্যামেল, নিউ, মার্কেট, নিউ দিল্লি, নিউ জিল্যান্ড, কুয়ালা লামপুর পোস্ট, মাস্টার, স্টেশন, স্টোর, ইস্টার্ন, স্ট্রিট, স্টিল, গ্রিল, স্টিমার গির্জা, যিশু, খ্রিস্ট, খ্রিস্টান্দ।

পারিভাষিক শব্দ

পারিভাষিক শব্দ ০-১:

নবম দশম শ্রেণির বই থেকে: অক্ষজান- Oxygen , উদয়ান-Hydrogen , নথি-File , প্রশিক্ষণ-Training , ব্যবস্থাপক- Manager, বেতার-Radio , মহাব্যবস্থাপক-General Manager , সচিব-Secretary , স্নাতক- Graduate , স্নাতকোত্তর- Post graduate, সমাপ্তি-Final , সাময়িকী-Periodical , সমীকরণ-Equation ।

পারিভাষিক শব্দ :০১ -

A

Academic	অধিবিদ্যা / শিক্ষায়তনিক	Author	লেখক / গ্রন্থকার
Allotment	বরাদ্দ	Appendix	পরিশিষ্ট
Admit card	প্রবেশ পত্র	Agenda	আলোচ্য-সূচি
Affidavit	শপথনামা / হলফনামা	Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক / তদর্থক
Adult education	বয়স্ক শিক্ষা	Air-conditioned	শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
Acting	ভারপ্রাপ্ত / অস্থায়ী	Adviser	উপদেষ্টা
Academic year	শিক্ষাবর্ষ	Aid	সাহায্য
Address of welcome	অভিনন্দন পত্র বা সংবর্ধনা	Air-mail	বিমান-ডাক

	ভাষণ		
Account	হিসাব	Admission	ভর্তি, প্রবেশ
Autonomous	স্বায়ত্ত্বাসিত	Assembly	পরিষদ, সভা
Acknowledgement	প্রাপ্তিষ্ঠাকার	Acting editor	ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
Administrator	প্রশাসক	Abbreviation	সংক্ষেপণ
Article	অনুচ্ছেদ	Auditor	হিসাবনিরীক্ষক
Articles	নিয়মাবলি / ধারা	Assembly house	সংসদ ভবন
Agreement	চুক্তি / সম্মতি / মতৈক্য	Accessories	সরঞ্জাম

B

Boyscout	ব্রতী বালক	Banker	ব্যাংক মালিক
Bearer	বাহক	Bail	জামিন
Biography	জীবনচরিত, জীবনী	Book-post	খোলা ডাক
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত	Ballot-paper	ভোটপত্র
Basic	মৌলিক, মৌল	Bidder	নিলাম ডাকিয়ে
Basic pay	মূল বেতন	Break of study	অধ্যয়ন-বিরতি, শিক্ষা বিরতি
Background	পটভূমি	Brand	ছাপ, মার্ক
Bureau	সংস্থা	Bidding	নিলাম ডাক

C

Capital	পুঁজি, মূলধন	Cable	তার
Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ	Chancellor	আচার্য
Caption	শিরোনাম, পরিচিতি	Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র
Campus	অঙ্গন / ক্যাম্পাস	Code	বিধি, সংকেত
Consumer goods	ভোগ্যপণ্য	Copyright	লেখসন্ধি
Carbon di-oxide	অঙ্গারাক্সিজন	Calender	ইন্সি
Constitution	সংবিধান	Care-taker	তত্ত্বাবধায়ক
Catalogue	তালিকা, গ্রন্থতালিকা	Coldstorage	হিমাগার
Conduct	আচরণ	Civil war	গৃহযুদ্ধ
Calendar	পঞ্জিকা	Cordon	বেষ্টনী
Copy	প্রতিলিপি	Conference	সম্মেলন

D

Diplomat	কূটনীতিক	Deed of gift	দানপত্র
Deputation	প্রেরণ	Dialect	উপভাষা
Diagnosis	নির্দান / রোগনির্ণয়	Data	উপাত্ত
Defence	প্রতিরক্ষা	Deed	দলিল
Donation	দান, অনুদান	Diplomacy	কূটনীতি
Demonstrator	প্রদর্শক	Dowry	যৌতুক
Donor	দাতা	Deputy	উপ-প্রতিনিধি
Dynamic	গতিশীল, গভীর	Deputy Secretary	উপ-সচিব

E

Editor	সম্পাদক	Equation	সমীকরণ
Editorial	সম্পাদকীয়	Embargo	অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা
Edition	সংস্করণ	Expert	বিশেষজ্ঞ
Enquiry	অনুসন্ধান, তদন্ত	Excuse	অজুহাত
Exchange	বিনিময়	Ex-officio	পদাধিকার বলে

F

File	নথি	Fiction	কথাসাহিত্য
Faculty	অনুষদ	Fundamental	মৌলিক / মৌল / মূল
Forecast	পূর্বাভাস	Follow-up	অনুসরণ করা

G

Gazetted	ঘোষিত	Goodwill	সুনাম
Global	বৈশ্বিক	Godown	গুদাম
Galaxy	ছায়াপথ	Green-room	সাজাঘর
Geology	ভূতত্ত্ব	Gunny	চট্ট
Green house	সবুজ বলয়	Gazette	ঘোষণাপত্র

H

Hostile	বৈরী, প্রতিকূল	Home Ministry	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Hand bill	প্রচারপত্র	Hood	বোরখা, বোরকা
Hostage	জিঞ্চি	Hypocrisy	কপটতা, ভওামি
Headline	শিরোনাম	Hand-book	তথ্যপুস্তিকা

I

Interview	সাক্ষাৎকার	Irrigation	সেচ
Internal	অভ্যন্তরীণ	Immigrant	অভিবাসী
Index	নির্ণট, নির্দেশক	Idiom	বাগধারা
Interim	অন্তর্ভুক্তিকালীন	Interpreter	দোভাসী

J

Justice	বিচারপতি	Judge	বিচারক
---------	----------	-------	--------

K

Key-word	মূল-শব্দ	Key note	মূল ভাব, মূল সূর
----------	----------	----------	------------------

L

Leap-year	অধিবর্ষ	Legend	কিংবদন্তি
Literature	সাহিত্য	Limited	সীমিত, সীমাবদ্ধ
Lien	পূর্বস্বত্ত্ব / লিয়েন	Lock-up	হাজত

M

Manuscript	পাণ্ডুলিপি	Method	প্রণালি
Mayor	মেয়ার, পুরকর্তা	Memorandum	স্মারকলিপি
Manifesto	ইশতেহার	Mercury	পারদ
Millennium	সহস্রাব্দ	Medical College	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

N

Nationality	জাতীয়তা	Nationalisation	জাতীয়করণ / রাষ্ট্রীয়করণ
National Assembly	জাতীয় পরিষদ	Notice Board	বিজ্ঞপ্তি ফলক
Note	মন্তব্য	Nursery	শিশুমালা / তরুশালা

O

Obedient	অনুগত, বাধ্য	Occupation	ব্রাতি / পেশা / দখল
Option	ইচ্ছা	Optional	গ্রাহিক
Office-bearer	কর্মচারী	Out-post	ফাঁড়ি

P

Passport	ছাড়পত্র / পাসপোর্ট	Parliament	সংসদ
Public	সরকারি লোক / জনসাধারণ	Publication	প্রকাশনা
Public works	গণপূর্তি	Pollution	দূষণ
Principle	তত্ত্ব / সূত্র / নীতি	Principal	অধ্যক্ষ / প্রধান
Para	অনুচ্ছেদ	Payee	প্রাপক
Pay-bill	বেতন-বিল / বেতন-পত্র	Philanthropist	লোকহিতৈষী

Q

Quarantine	সঙ্গরোধ		
------------	---------	--	--

R

Rank	পদমর্যাদা	Registration	নিবন্ধন
Republic	প্রজাতন্ত্র	Regiment	সেন্যাদল
Routine	রুটিন / নিয়ন্ত্রণ	Ratio	অনুপাত
Relation	সম্পর্ক		

S

Sanction	অনুমোদন / মন্তব্য	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Salary	বেতন	Secondary	মাধ্যমিক
Sir	মহোদয় / জনাব / স্যার	Sabotage	অন্তর্ধাত
Scale	মাপনী / স্কেল / ক্রম	Secretary	সচিব

T

Termination	অবসান	Theory	তত্ত্ব / সিদ্ধান্ত / সূত্র
Telecommunication	টেলিযোগাযোগ		

U

Union	সংঘ / ইউনিয়ন; সংযোগ	Urbanization	নগরায়ন
Up-to-date	হালনাগাদ		

V

Valid	বৈধ / সিদ্ধ / চালু	Vocation	বৃত্তি
Venue	স্থান	Vehicle	যান / গাড়ি
Viva-voce	মৌখিক পরীক্ষা	Vacation	অবকাশ / ছুটি

W

Worship	পূজা	White paper	শ্বেতপত্র
Walk-out	সভাবর্জন / ওয়াক আউট		

X

X-ray	রঞ্জনরশ্মি		
-------	------------	--	--

Y

Year-Book	বর্ষপঞ্জি		
-----------	-----------	--	--

Z

Zoo	চিড়িয়াখানা	Zone	অঞ্চল; বলয় / মণ্ডল
-----	--------------	------	---------------------

সমার্থক শব্দ:

সমার্থক শব্দ: সমার্থক শব্দে ভালো দক্ষতার জন্যে বাংলা শব্দের গঠনগত দিকের (মৌলিক ও সাধিত শব্দ) উপর ভালো দখল রাখুন। তাহলে অনেক সাধিত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন। যেমন- ‘ভু’ অর্থ – পৃথিবী। কিন্তু ভু + তল = পৃথিবীর পৃষ্ঠ অর্থাৎ মাটি। ‘কর’ অর্থ আলো। সুতরাং ‘দিবাকর’ ‘মানে দিনে কর দেয় যে অর্থাৎ ‘সূর্য’। আবার, ‘কর’-এর আগে ‘নিশা(রাত)’ বসলে (নিশাকর) বুঝায় – নিশিতে কর দেয় যে অর্থাৎ চাঁদ।

#**পৃথিবী:** ** ধর + আ, গী, ইত্রী = পৃথিবী (অর্থাৎ – ধরা, ধরণী, ধরিত্রী)।

** ভু (পৃথিবী) + মণ্ডল/লোক = পৃথিবী। (অর্থাৎ – ভু, ভুমণ্ডল, ভুলোক)।

** বসু + ধা, মতী, ক্লৰা = পৃথিবী (অর্থাৎ – বসুধা, বসুমতী, বসুন্ধরা)।

** **অখিলপৃথী** অবনীর মেয়ে উৰী, মহী ও মেদিনীকে নিয়ে বসুন্ধরা সিটিতে গেল।

উপরের বাক্যের, অখিল, পৃথী, অবনী, উৰী, মহী, মেদিনী পৃথিবীর সমার্থক শব্দ।

#**সূর্য** **তপনআদিত্য ও ভানুবিশ্ব আক্ষতাবের সাথে সবিতাব বিয়ে দিতে ফুল আনতে ভাস্কর, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাকর ও বিভাবসুকে অর্কের বক্ষু মার্তণের কাছে পাঠালো।

উপরের বাক্যে- তপন,আদিত্য,ভানু,রবি, আফতাব,সবিতা,ভাস্কর, দিবাকর,প্রভাকর,বিভাকর,বিভাবসূর্য,অর্ক,মার্ত্তঙ্গ সূর্যের প্রতিশব্দ।
** মিহির, অরূপ।
** দিনমণি, দিনেশ, দিননাথ।
**পুষা,অর্ঘ্যা,অংশুমালী, কিরণমালী এগুলোও সূর্যের প্রতিশব্দ।

#চাঁদ **শশাঙ্কশশী বিধুচন্দ্রকে হত্যা করতে সোমবারে কুমুদনাথ মৃগাঙ্ক ও সুধানিধিকে সুধাংশু, হিমাংশু ও শীতাংশুর বাড়িতে পাঠালো।

**উপরের বাক্যের – শশাঙ্ক, শশী,বিধু চন্দ্র,সোম,কুমুদনাথ, মৃগাঙ্ক, সুধানিধি,সুধাংশু, হিমাংশু শীতাংশু চন্দ্রের প্রতিশব্দ।
**নিশা + পতি,কান্ত = চন্দ্র
**কলা + ধর,নিধি,ভৎ = চন্দ্র
**হিমকর, চন্দ্রমা এগুলোও চন্দ্রের প্রতিশব্দ।

#পুত্র: নন্দনের তিন ছেলে তনয় সুত ও সুনু।

** উপরের বাক্যের – নন্দন,ছেলে,তনয়,সুত ও সুনু – পুত্রের প্রতিশব্দ।
** দুলাল,আঘাজ, অঙ্গজ – এগুলোও পুত্রের প্রতিশব্দ।

#কন্যা: পুত্রের প্রতিশব্দগুলোকে স্ত্রীবাচক করলেই সহজে কন্যার সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন –
নন্দন – নন্দিনী, ছেলে – মেয়ে, তনয় – তনয়া, সুত – সুতা, দুলাল- দুলালী, আঘাজ – আঘাজা, * দুহিতা – কন্যার প্রতিশব্দ।

স্বামী : দয়িতনাথ কান্তের স্বামী।

** উপরের বাক্যের – দয়িত, নাথ, কান্ত – এগুলো স্বামীর প্রতিশব্দ।

স্ত্রী: কলত্রাবের ভার্যাপল্লী ‘বনিতা’ অর্ধাঙ্গিনী না হয়ে সহধর্মিণী হতে চায়।

**উপরের বাক্যের – কলত্র, দার, ভার্যা, পল্লী, বনিতা, অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণী হল স্ত্রীর প্রতিশব্দ।
* * ‘কান্ত’ অর্থ স্বামী হলে ‘কান্তা’ স্ত্রী হবে। অর্থাৎ –
কান্ত (স্বামী) – কান্তা (স্ত্রী)।

নারী :সীমন্তিনী অঙ্গনা রামা বামাকে কামিনী ও ভামিনীর কাছে পাঠালো।

** উপরের বাক্যে – সীমন্তিনী, অঙ্গনা, রামা, বামা, কামিনী ও ভামিনী হল নারীর প্রতিশব্দ।
** স্ত্রীজাতি, অবলা, ললনা, মহিলা রমণী – এগুলো আমাদের জানাণনা নারীর প্রতিশব্দ।

#রাজা: ** পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রতিশব্দের সাথে ‘পতি(প)/পাল/নাথ/ইন্দ্র/ঈশ শব্দ মুক্ত হলে ‘রাজা’র প্রতিশব্দ হয়। যেমন –

ভূ +পতি = ভূপতি (রাজা),
ভূ +প =ভূপ (রাজা)
ভূ + পাল =ভূপাল (রাজা),
ক্ষিতি + পতি = ক্ষিতিপতি (রাজা),
ক্ষিতি + প =ক্ষিতিপ (রাজা),
মহী +পাল =মহীপাল (রাজা),
রাজ্য + পাল =রাজ্যপাল (রাজা),

মহী + নাথ = মহীনাথ (রাজা),

মহী + প = মহীপ (রাজা),

মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র (রাজা),

ক্ষিতি + টৈশ = ক্ষিতীশ (রাজা)

** 'নর / নৃ' – এর পরে পতি(প)/পাল/ইন্দ্র/টৈশ যুক্ত হলেও 'রাজা'র প্রতিশব্দ হয়। যেমন –

নৃপতি, নৃপ, নৃপেন্দ্র, নরপতি, নরেন্দ্র, নরেশ – এগুলোও রাজার প্রতিশব্দ।

** বাদশা, সম্রাট – আমাদের খুবই পরিচিত দুটো রাজার প্রতিশব্দ।

কোকিল : বসন্তদৃত কোকিল অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট ও পরপুষ্ট কলকর্ত্তকে মধুসখার মধুস্বর ও পিক খাওয়াইয়ে পরভূত করে।

** উপরের বাক্যের – বসন্তদৃত, অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকর্ত্ত, মধুসখা, মধুস্বর, পিক ও পরভূত হল কোকিলের প্রতিশব্দ।

** অন্য, কাক, পর + পুষ্ট = অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট (কোকিল)।

** মধু + সখা, স্বর = মধুসখা, মধুস্বর (কোকিল)।

** এছাড়াও কলকর্ত্ত, পিক, পরভূত।

কাক : বায়স কাককে পরভূৎ করে।

** উপরের বাক্যের – বায়স, পরভূৎ কাকের প্রতিশব্দ।

বি.দ্র. পরভূত = কোকিল কিন্তু পরভূৎ = কাক।

কবুতর : কপোত ও পায়রা কবুতরের প্রতিশব্দ।

** উপরের বাক্যের – কপোত, পায়রা কবুতরের প্রতিশব্দ।

পাথি: তিন ভাই বিহগ, বিহঙ্গ ও বিহঙ্গম প্রতিবেশী পতত্রী, দ্বিজ ও অণোজকে বিখ্যাত দুই গন্তব্য খগ ও খেচরকে দেখাতে পক্ষীসহ বনে নিয়ে গেল।

** উপরের বাক্যের – বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পতত্রী, দ্বিজ, অণোজ, গন্তব্য, খগ, খেচর, পক্ষী হল পাথির প্রতিশব্দ।

ভ্রমর : ** মধু + প, কর, লেহ, লিট, ভৃৎ, মক্ষিকা = মৌমাছি।

অর্থাৎ, মধুপ, মধুকর, মধুলেহ, মধুলিট, মধুভৃৎ, মধুমক্ষিকা হল মৌমাছির প্রতিশব্দ।

** ষটপদ ভৃঙ্গ ব্রিরেফ শিলীমুখ অলিকে ভ্রমর বা ভোমরার কাছে নিল।

** উপরের বাক্যের – ষটপদ, ভৃঙ্গ, ব্রিরেফ, শিলীমুখ, অলি, ভ্রমর ও ভোমরা হল মৌমাছির প্রতিশব্দ।

গন্তব্য গো : গাভী, ধেনু, পয়ঃস্ত্বিনী।

ঘোড়া : ঘোটক অশ্বের সাথে বাজী ধরে তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম হয়।

** উপরের বাক্যের – ঘোটক, অশ্ব, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম ও হয় → ঘোড়ার প্রতিশব্দ।

সিংহ : পশুরাজ মৃগরাজ মৃগেন্দ্র হর্ষক হরির মেয়ে কেশরীকে বিয়ে করে।

** উপরের বাক্যের – পশুরাজ, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, হর্ষক, হরি, কেশরী হল সিংহের প্রতিশব্দ।

হাতি : দ্বিরদের ছেলে করীগজকে বারণ করার পরেও দন্তীর মেয়ে হস্তীকে দেখতে জনহীন দ্বিপ মাতঙ্গকুঞ্জে গেল।

** উপরের বাক্যের – দ্বিরদ, করী, গজ, বারণ, দন্তী, হস্তী, দ্বিপ, মাতঙ্গ, কুঞ্জের হল হস্তী বা হাতির প্রতিশব্দ।

হরিণ : শম্ভুর, মৃগ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, সারঙ্গ, সুনয়ন।

সাপ : তিন বোন নাগ,উরগ ও পল্লগ কাকোদৰের অন্য তিন ভাই ভুজগ,ভুজঙ্গ ও ভুজঙ্গমকে পেতে অহিনাগের কাছে যায়।

** উপরের বাক্যের – নাগ,উরগ,পল্লগ,কাকোদৰ, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, অহি, নাগ হল সাপের প্রতিশব্দ।

** এছাড়াও আমাদের পরিচিত – সর্প, আশীবিশ, ফণী, ফণাধর, ফণধর, বিষধর, বাযুভুক হল সাপের প্রতিশব্দ।

#ময়ূর : কলাপীর চার মেয়ে কেকা, কেকী, শিথী ও শিথঙ্গী।

এ বাক্যের – কলাপী, কেকা, কেকী, শিথী, শিথঙ্গী হল ময়ূরের প্রতিশব্দ। এছাড়াও ‘বহী’ও ময়ূরের প্রতিশব্দ।

সমার্থক শব্দের তালিকা:

অঞ্চিত*	অনল, পাবক, আগুন, দহন, সর্বভূক, শিখা, হতাশন, বহি, বৈশ্বানর, কৃশানু, বিভাবসু, সর্বশুটি
অঙ্ককার	আঁধার, তমঃ, তমিষা, তিমির, আঙ্কার, তমস্র, তম
আকাশ*	আসমান, অস্বর, গগন, নভোঃ, নভোমওল, থগ, ব্যোম, অন্তরীক্ষ
আলোক*	আলো, জ্যোতি, কিরণ, দীপ্তি, প্রভা
ইচ্ছা*	আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, অভিকৃষ্টি, অভিপ্রায়, আগ্রহ, স্পৃহা, কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, ঈচ্ছা, ঈহা
কপাল*	ললাট, ভাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি, অলিক
কোকিল*	প্রভৃতি, পিক, বসন্তদৃত
কন্যা	মেয়ে, দুষ্ঠিতা, দুলালী, আত্মজা, নন্দিলী, পুত্রী, সূতা, তনয়া
গরু	গো, গাভী, ধেনু
ঘোড়া	অশ্ব, ঘোটক, তুরংগ, বাজি, হয়, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম
ঘর	গৃহ, আলয়, নিবাস, আবাস, আশ্রয়, নিলয়, নিকেতন, ভবন, সদন, বাড়ি, বাটী, বাসস্থান
চক্ষু	চোখ, আঁখি, অক্ষি, লোচন, নেত্র, নয়ন, দর্শনেন্দ্রিয়
চন্দ্র*	চাঁদ, চন্দ্রমা, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, শুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সুধাংশু, হিমাংশু, সোম, বিধু, ইন্দু, নিশাকর, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, রঞ্জনীকান্ত
চুল	চিকুর, কুস্তল, কেশ, অলক,
জননী	মা, মাতা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী,
দিন	দিবা, দিবস, দিনমান
দেবতা	অমর, দেব, সূর, ত্রিদশ, অমর, অজর, ঠাকুর
দ্বন্দ্ব	বিরোধ, ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ
তীর	কূল, তট, পাড়, সৈকত, পুলিন, ধার, কিনারা
নারী	রমণী, কামিনী, মহিলা, স্ত্রী, অবলা, স্ত্রীলোক, অঙ্গনা, ভাসিনী, ললনা, কাণ্টা, পঞ্জী, সীমন্তনী
নদী*	তটিনী, তরপিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, প্রোতঙ্গিনী, গাঙ, স্বরিং, নির্বারিনী, কল্লোলিনী
নৌকা	নাও, তরণী, জলযান, তরী
পশ্চিত	বিদ্বান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ
পদ্ম*	কমল, উৎপল, সরোজ, পঙ্কজ, নলিন, শতদল, রাজীব, কোকনদ, কুবলয়, পুণরীক, অরবিন্দ, ইন্দীবর, পুষ্কর, তামরস, মৃগাল, সরসিজ, কুমুদ
পৃথিবী*	ধরা, ধরিত্বা, ধরণী, অবনী, মেদিনী, পৃ, পৃষ্ঠী, ভূ, বসুধা, বসুন্ধরা, জাহান, জগৎ, দুনিয়া, ভূবন, বিশ্ব, ভূ-মণ্ডল
পর্বত*	শৈল, গিরি, পাহাড়, অচল, অটল, অন্দি, চূড়া, ভূধর, নগ, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, মহীধর, মহীন্দ

পানি	জল, বারি, সলিল, উদক, অশু, নীর, পয়ঃ, তোয়, অপ, জীবন, পানীয়
পুত্র	তনয়, সুত, আত্মজ, ছেলে, নন্দন
পঞ্জী	জায়া, ভার্যা, ভামিনী, স্ত্রী, অর্ধস্ত্রী, সহধমিনী, বট, দারা, বনিতা, কলত্র, গৃহিণী, গিন্ধী
পাথি*	পঞ্জী, খেচর, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পতত্রী, খগ, অওজ, শকুন্ত, দ্বিজ
ফুল	পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, রঞ্জন
বৃক্ষ	গাছ, শাথী, বিটপী, অটবি, দ্রুম, মহীরুহ, তরু, পাদপ
বন	অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বিপিণ, কুঞ্জ, কাত্তার, অটবি, বনানী, গহন
বায়ু*	বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, মারুত, গন্ধবহ
বিদ্যুত*	বিজলী, বৃত্তিৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী, অচিরপ্রভা, শম্পা
মানুষ	মানব, মনুষ্য, লোক, জন, নৃ, নৰ,
মাটি	ক্ষিতি, মৃত্তিকা,
মেঘ*	জলধর, জীমৃত, বারিদ, নীরদ, পয়োদ, ঘন, অশুদ, তায়দ, পয়োধর, বলাহক, তোয়ধর
রাজা	নরপতি, বৃপতি, ভূপতি, বাদশাহ
রাত	রাত্রি, রজনী, নিশি, যামিনী, শৰ্বনী, বিভাবনী, নিশা, নিশিথিনী, ক্ষণদা, ত্রিয়ামা
শরীর	দেহ, বিগ্রহ, কায়, কলেবর, গা, গাত্র, তনু, অঙ্গ, অবয়ব
সর্প*	সাপ, আহি, আশীবিষ, উরহ, নাগ, নাগিনী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, ভুজঙ্গম, সরীসৃপ, ফণী, ফণাধর, বিষধর, বাযুভুক
স্ত্রী	পঞ্জী, জায়া, সহধমিনী, ভার্যা, বেগম, বিবি, বধু,
স্বর্ণ	সোনা, কনক, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেম, হিরণ্য, হিরণ
স্বর্গ	দেবলোক, দুলোক, বেহেশত, সুরলোক, দূ, ত্রিদশালয়, ইন্দ্রালয়, দিব্যলোক, জাগ্নাত
সাহসী	অভীক, নিভীক,
সাগর*	সমুদ্র, সিন্ধু, অর্ণব, জলধি, জলনিধি, বারিধি, পারাবার, রঞ্জকর, বরুণ, দরিয়া, পারাবার, বারীন্দ্র, পাথার, বারীশ, পয়োনিধি, তোয়ধি, বারিনিধি, অশুধি
সূর্য*	রবি, সবিতা, দিবাকর, দিনমনি, দিননাথ, দিবাবসু, অর্ক, ভানু, তপন, আদিত্য, ভাস্কর, মার্ত্তণ, অংশু, প্রভাকর, কিরণমালী, অরুণ, মিহির, পুষা, সূর, মিত্র, দিনপতি, বালকি, অর্ষমা
হাত*	কর, বাহু, ভুজ, হস্ত, পাণি
হস্তী*	হাতি, করী, দষ্টী, মাতঙ্গ, গজ, প্রিরাবত, দ্বিপ, দ্বিরদ, বারণ, কুঞ্জর, নাগ
চেউ*	তরঙ্গ, উর্মি, লহরী, বীচি, মওজ

বিপরীতার্থক শব্দ:

Part-1:

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	উৎকৃষ্ট	অপৃকৃষ্ট	তরুণ	প্রবীণ
অনুলোম	প্রতিলোম	উপসর্গ	অনুসর্গ	তিক্ত	মধুর

অনুজ	অগ্রজ	উপগত	অপগত	ত্যাগ	ভোগ
অন্তর	বাহির	উদ্বাত	বিনীত	স্বরা	বিলম্ব
অপকার	উপকার	উওরণ	অবতরণ	তিমির	আলোক
অমৃত	বিষ , গরল	উদার	সংকীর্ণ	তরল	কঠিন
অনুরক্ত	বিরক্ত	ঝজু	বক্র	তিরঙ্কার	পুরঙ্কার
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	উর্ধ্ব	অধঃ	তৃষ্ণি	অতৃষ্ণি
অনুকূল	প্রতিকূল	উষা	সন্ধ্যা	তাপ	শেত্য
অনুরাগ	বিরাগ	উর্ধ্বগামী	নিম্নগামী	তক্ষন	সাধু
অণু	বৃহত	একাল	সেকাল	তেজি	মেদা , মন্দা
অন্ত্য	আদ্য	এযুগ	সেযুগ	তারুণ্য	বার্ধক্য
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	একমত	ব্রিমত	তেজ	নিষ্ঠেজ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	এপৰ্য	ওপৰ্য	তীব্র	লঘু
অধর্মণ	উত্তমণ	ত্রিহিক	পারত্রিক	তামসিক	রাজসিক
অর্থ	অনর্থ	ত্রিষ্ণিক	আবশ্যিক	থামা	চলা
অনির্বাণ	নির্বাণ	এঁড়ে	বকনা	দান	গ্রহণ , প্রতিদান
অধিত্যকা	উপত্যকা	ত্রিশৰ্য	দারিদ্র্য	দাস	প্রভু
অবিরল	বিরল	ত্রিক্য	অনেকা/বিভেদ	দীন	ধনী
অসীম	সসীম	ওদ্বৃত্য	বিনয়	দুরন্ত	শান্ত
অধম	উত্তম	ওদ্বার্য	কার্পণ্য	দ্রুত	হ্রস্ব
অলস	পরিশ্রমী	কুটিল	সরল	দরদি	নির্দয়
অর্বাচীন	প্রাচীন	কৃত্রিম	স্বাভাবিক	দাস	প্রভু
অর্জন	বর্জন	কৃপণ	বদান্য	দুঃখ	সুখ
অর্পণ	গ্রহণ	কুতস্তি	সুল্লৱ	দুর্বার	নির্বার
অতিকায়	শ্ফুর্দ্রকায়	কৃষ্ণ	শুল্ক , শুভ্র	দৃশ্য	অদৃশ্য
অলীক	সত্য	কোমল	কঠিন/কর্কশ	দুশ্মন	দোষ্ট
অম্র	মধুর	কৃতজ্ঞ	কৃতৱ্য	দুর্নভ	সুলভ
অগ্র	পশ্চাত্	কুৎসা	প্রশংসা	দেনা	পাওনা
অভ্যাস	অনভ্যাস	করাল	সৌম্য	দুঃখভি	সুকুতি
অপরাধ	নিরপরাধ	কপট	অকপট	দুল্যেক	ভুলোক
অগ্রগামী	পশ্চাত্গামী	কেজো	অকেজো	দিন	রাত
অনশন	অশন	কৃশ	স্তুল	দূর	নিকট
অন্ধকার	আলোক	কনিষ্ঠ	জোর্ষ	দৃষ্টি	অদৃষ্টি
অবনত	উল্লত	কর্কশ	কোমল	ধ্বল	কৃষ্ণ
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	কাজ	অকাজ	ধীর	অধীর
আকুঞ্জন	বিকুঞ্জন , প্রসারণ	কাল্পা	হাসি	ধনী	গরিবনির্ধন/
আগম	লোপ	ক্রয়	বিক্রয়	ধর্ম	অধর্ম
আদর	মৃণা	ক্রোধ	প্রীতি	ধূর্ত	সাধু
আদ্য	অন্ত্য	ক্ষীণ	পুষ্ট	ন্য	উদ্বাত
আপত্তি	সম্মতি	ক্ষয়িক্ষু	বর্ধিক্ষু	নাগর	গ্রাম্য

আবহন	বিসর্জন	ক্ষিপ্ত	শান্ত	নাস্তিক	আস্তিক
আবির্ভাব	তিরোভাব	ক্ষয়	বৃদ্ধি	নিত্য	নৈমিত্তিক
আশু	বিলম্ব	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	নিষেধ	বিধি
আশ্লেষ	বিশ্লেষ	ক্ষুদ্র	বৃহত্	নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস
আসক্ত	বিরক্ত	খোলা	ঢাকা	নীরস	সরস
আগমন	নির্গমন/প্রত্যাগমন	থ্যাতি	অথ্যাতি	নতুন	পুরাতন
আলোক	অন্ধকার	থাতক	মহাজন	নিরাকার	সাকার
আশা	নিরাশা	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	নিন্দা	স্তুতি
আচার	অনাচার	গান্ধীর্য	চাপল্য	নিরক্ষর	সাক্ষর
আঙ্গীয়	অনাঙ্গীয়	গুপ্ত	ব্যাপ্ত , প্রকাশিত	নির্লজ্জ	সলজ্জ
আবশ্যক	অনাবশ্যক	গোপন	প্রকাশ	নগণ্য	গণ্য
আবিল	অনাবিল	গরল	অমৃত	নিরথর্ক	সার্থক
আস্থা	অনাস্থা	গ্রহণ	বর্জন	নরম	কঠিন
আস্তিক	নাস্তিক	গৌরব	লাঘব	ন্যূন	অধিক
আঁষ্ঠি	শাঁস	গ্রাম্য	নাগরিক , শহরে	নিদ্রা	জাগরণ
আদান	প্রদান	গুরু	লঘু	নগর	গ্রাম
আমদানি	রঞ্চানি	গৃহী	সন্ন্যাসী	নির্মল	মলিনপক্ষিল/
আয়	ব্যয়	গঞ্জনা	প্রশংসা	নিন্দুক	স্তাবক
আর্ত	দরিদ্র	গৌণ	মুখ্য	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
আলসে	কর্ম্ম	গ্রহীতা	দাতা	নশ্বর	শাশ্বত
আকাশ	পাতাল	গুরু	শিষ্য	নিরত	বিরত
আরোহণ	অবতরণ	ঘাত	প্রতিঘাত	নশ্বর	অবিনশ্বর
আলস্য	শ্রম	ঘোলা	স্বচ্ছ	নির্দয়	সদয়
আর্দ্র	শুষ্ক	ঘন	তরল	পঁচা	টাটকা , তাজা
আটক	ছাড়	ঘনে	বাইরে	পন্ড	সফল
আবদ্ধ	মুক্ত	চঞ্চল	স্থির	পদ্ধিত	মূর্খ
আগ্রহ	উপেক্ষা	চড়াই	উৎরাই	পর	স্ব , আস্ত
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	চেতন	জড়	পশ্চাত্	সম্মুখ
আকস্মিক	চিরন্তন	চোর	সাধু	পাপী	পুণ্যাত্মা , পুণ্যবান
আবৃত	অনাবৃত	চতুর	নির্বোধ	পাশ্চাত্য	প্রাচ্য
আসামি	বাদী	চোখা	ভোঁতা	প্রফুল্ল	স্নান
আগম	নির্গম	চেনা	অচেনা	প্রবল	দুর্বল
ইহ	পরত্র	চয়	অপচয়	প্রবৃত্তি	নিরৃতি
ইতর	ভদ্র	চক্ষুব্লান	অন্ধ	পরিশ্রমী	অলস
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ছাড়া	ধরা	পতি	পঞ্জী
ইষ্ট	অনিষ্ট	জঙ্গম	স্থাবর	প্রসন্ন	বিষণ্ণ
ইহকাল	পরকাল	জনা	যৌবন	পুরোভাগ	পশ্চাদ্বাগ
ঈষ্ট	অধিক	জয়	প্রাজয়	পটু	অপটু
ঈদৃশ	তাদৃশ	জ্বলন্ত	নিভৃত	প্রাচ	পতীচ্য

ঈর্ষা	প্রীতি	জোয়ার	ভাটা	পদস্থ	নিষ্কাশ
ঈক্ষিত	অবীক্ষিত	জন্ম	মৃত্যু	প্রতিযোগী	সহযোগী
উচ্চ	নীচ	জীবন	মরণ	পড়তি	উঠতি
উত্তমণ	অধমণ	জানা	অজানা	প্রাচীন	অর্বাচীন
উত্থান	পতন	জড়	চেতন	প্রশংস্তি	নিন্দা
উদয়	অস্ত	জাগরিত	নিদ্রিত	প্রবীণ	নবীন
উন্মুখ	বিমুখ	জাগ্রত	সুপ্ত	প্ররক্ষীয়	স্বকীয়
উন্মীলন	নিমীলন	জীবিত	হত	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
উজান	ভাটি	জ্ঞানী	মুর্খ	পুর্ণিমা	অমাবস্যা
উক্ত	অনুক্ত	ঝানু	অপটু , অপক্ষ	পুষ্ট	ক্ষীণ
উত্তম	অধম	ঝুনা	কাঁচা	পাপ	পুণ্য
উপরোধ	অনুরোধ	টাটকা	বাসি	প্রশ্ন	উত্তর
উপকার	অপকার	ঠেকা	জেতা	পারত্রিক	প্রিহিক
উপস্থিত	অনুপস্থিত	ঠাণ্ডা	গরম	প্রভু	ভূত্য
উগ্র	মৃদু /সৌম্য	ঠিক	বেঠিক	পালক	পালিত
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ঠুনকা	মজবুত	প্রশস্ত	সংকীর্ণ
উহ	স্পষ্ট	ডুবন্ত	ভাসন্ত	প্রস্থান	আগমন
উজ্জ্বল	ম্লান	ডাগন	ছোট	প্রত্যাদেশ	আদেশ
উন্নতি	অবনতি	চেংগা	খাটো	ফলন্ত	অফলা , নিষ্কলা
উপচয়	অপচয়	চোসা	হালকা	ফরসা	কালো

Part-2:

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধুর	মসৃণ	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
বিরহ	মিলন	সার	অসার
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	স্বর্গ	নরক
বৈরাগ্য	আসক্তি	সংক্ষি	বিগ্রহ
বিষাদ	আনন্দ	সদাচার	কদাচার
ব্যর্থ	সার্থক	সমাপ্ত	আরম্ভ
ব্যষ্টি	সমষ্টি	সংকীর্ণ	প্রশস্ত
ব্যয়	সঞ্চয়	সরল	বক্র
বন্ধু	শত্রু	সমষ্টি	ব্যষ্টি
বিবাদ	মিত্রতা	সঞ্চয়	অপচয়
বন্ধন	মুক্তি	সুলভ	দুর্ভ
বাদী	বিবাদী , প্রতিবাদী	সার্থক	ব্যর্থ
বিশেষ	সামান্য	স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য
বিনীত	গর্বিত	ঙ্গিঞ্চ	ক্লক্ষণ
বিরল	বহুল	সুশীল	দুঃশীল

বিধি	নিষেধ	সুগম	দুর্গম
বিপদ	সম্পদ	সহযোগী	প্রতিযোগী
বিষ	অমৃত	স্তুতি	নিল্দা
বাধ্য	অবাধ্য	সুরভি	পুতি
বিরত	নিরত	সুশ্রী	বিশ্রী
বৃদ্ধি	লাঘব	সমক্ষ	পরোক্ষ
বিজেতা	বিজিত	সাবধান	অসাবধান
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ	হর্তা	ভর্তা
বাচাল	স্বল্পভাষী	হষ্ট	বিষণ্ণ
বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ	হরদম	কদাচিত্
ভন্দ	সাধু	হাল	সাবেক
ভর্তি	উন , থালি	হস্যতা	কপটতা
ভূত	ভরিষ্যত্	সন্ধি	বিগ্রহ
ভোতা	ধারাল , তীক্ষ্ণ	সম্পদ	বিপদ
ভীকু	সাহসী	সুস্ক	স্তুল
ভাটা	জোয়ার	সৃষ্টি	সংহার
ভয়	সাহস	সিত	কৃষ্ণ
ভিতর	বাহির	স্নান	বিস্মরণ
ভদ্র	ইতর	স্বকীয়	পরকীয়
মজবুত	হালকা	স্বচ্ছ	ঘোলা
মহত্ত	ক্ষুদ্র	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
মান	অপমান	স্থির	চঞ্চল
মান্য	ঘৃণ্য	স্থাবর	জঙ্গম
মুখ্য	গৌণ	সমতল	অসমতলবন্ধুর/
মৃদু	তীব্র	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
মৌল	মুখর	সার	অসার
মনোনীত	অমনোনীত	স্বর্গ	নরক
মিলন	বিরহ	সন্ধি	বিগ্রহ
মিথ্যা	সত্য	সদাচার	কদাচার
মধুর	কটু	সমাপ্ত	আরম্ভ
যশ	নিল্দা , অপযশ	সংকীর্ণ	প্রশস্ত
যোগ	বিয়োগ	সরল	বক্র
যতি	সংযতী	সমষ্টি	ব্যষ্টি
যোজক	প্রণালী	সংঘয়	অপচয়
রসিক	বেরসিক	সুলভ	দুর্লভ
রাজা	প্রজা	সার্থক	ব্যর্থ
রোষ	প্রসাদ	স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য
রোগী	নীরোগ	স্লিষ্ট	রুক্ষজন
রুষ্ট	তুষ্ট	সুশীল	দুঃশীল
রিক্ত	পূর্ণ	সুগম	দুর্গম
রুদ্ধি	মুক্ত	সহযোগী	প্রতিযোগী
রম্য	কুত্ সিত	স্তুতি	নিল্দা
রাগ	বিরাগ	সুরভি	পুতি

ଲାଘବ	ଗୋରବ	ସୁନ୍ଦୀ	ବିଶ୍ରୀ
ଲାଭ	ଲୋକମାନ	ସମକ୍ଷ	ପରୋକ୍ଷ
ଲକ୍ଷ୍ୟ	ଅଲକ୍ଷ୍ୟ	ସାବଧାନ	ଅସାବଧାନ
ଲଘୁ	ଓର୍କ	ହର୍ତ୍ତା	ଭର୍ତ୍ତା
ଲାଲ	କାଲ	ହର୍ଷତ	ବିଷଗ୍ନ
ଲବ	ହର	ହରଦମ	କଦାଚିତ୍
ଲୟ	ସୃଷ୍ଟି	ହଲ	ସାବେକ
ଲଘିର୍ତ୍ତ	ଗରିର୍ତ୍ତ	ହଦ୍ୟତା	କପଟତା
ଲାଜୁକ	ନିର୍ଶଜ	ହରଣ	ପୂରଣ
ଶତ୍ରୁ	ମିତ୍ର	ହରଦମ	କଦାଚିତ୍
ଶୀତ	ଗ୍ରୀବ୍ଲ୍	ହଲ	ସାବେକ
ଶୁକ୍ଳ	କୂଷ୍ଠ	ହଦ୍ୟତା	କପଟତା
ଶୁଣ୍ୟ	ପୂର୍ଣ୍ଣ	ହରଣ	ପୂରଣ
ଶୋକ	ହର୍ଷ	ହତ	ଜୀବିତ
ଶ୍ରୀ	ବିଶ୍ରୀ	ହ୍ରାସ	ବୃଦ୍ଧି
ଶିଷ୍ଟ	ଅଶିଷ୍ଟ	ହର୍ଷ	ବିଶାଦ
ଶିଷ୍ୟ	ଓର୍କ	ହକ	ନାହକ
ଶନ୍କା	ଘ୍ରା		
ଶୁଭ	ଅଶୁଭ		
ଶୀତଳ	ଉଷ୍ଣ		
ଶତ୍ର	ନରମ		
ଶୁଖୋ	ହାଜା		
ଶୀର୍ଗ	ଶୁଲ		
ଶାନ୍ତ	ଦୂରାନ୍ତ		
ଶର୍ତ୍ତ	ମାଧୁ		
ଶ୍ରମ	ବିଶ୍ରାମ		
ଶ୍ଵାସ	ପ୍ରଶ୍ଵାସ		
ସଂକ୍ଷେପ	ବାହଲ୍ୟ		
ସଂଯୋଗ	ବିଯୋଗ		
ସଚେଷ୍ଟ	ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ		

ଧନି

ଧନି : କୋନ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣେର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକଟି ହଲୋ ଧନି। ଭାଷାକେ ବା ଭାଷାର ବାକ ପ୍ରବାହକେ ବିଶେଲଷଣ କରଲେ କତଗୁଲୋ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ବା ମୌଲିକ ଧନି ପାଓଯା ଯାଯା। ଯେମନ- ଅ, ଆ, କ, ଥ, ଇତ୍ୟାଦି।

ଧନି ମୂଲ୍ୟ ୨ ପ୍ରକାର- ସ୍ଵରଧନି ଓ ବ୍ୟାଙ୍ଗନଧନି।

ସ୍ଵରଧନି : ଧନି ଉଚ୍ଚାରଣେର ସମୟ ମାନୁଷ ଫୁସଫୁସ ଥେକେ କିଛୁ ବାତାସ ଛେଡେ ଦେଯା। ଏବଂ ସେଇ ବାତାସ ଫୁସଫୁସ କର୍ତ୍ତନାଲୀ ଦିଯେ ଏମେ ମୁଖ ଦିଯେ ବେର ହୋଯାର ପଥେ ବିଭିନ୍ନ ଜାୟଗାୟ ଧାକ୍କା ଥେଯେ ବା ବାଁକ ଥେଯେ ଏକେକ ଧନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଯେ ଧନିଗୁଲୋ ଉଚ୍ଚାରଣେର ସମୟ ଏଇ ବାତାସ କୋଥାଓ ବାଧା ପାଯ ନା, ବା ଧାକ୍କା ଥାଯ ନା, ତାଦେରକେ

স্বরধ্বনি বলে। যেমন, অ, আ, ই, উ, ঔ, ইত্যাদি। এগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস ফুসফুস থেকে মুখের বাহিরে আসতে কোথাও ধাক্কা থায় না।

ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস মুখের বাহিরে আসার পথে কোথাও না কোথাও ধাক্কা থায়, বা বাধা পায়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন- ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস জিহবামূল বা কর্ণে ধাক্কা থায়। তাই এগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি।

বর্ণ : বিভিন্ন ধ্বনিকে লেখার সময় বা নির্দেশ করার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বর্ণ বলে।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

হস্ত বা হল্প ধ্বনি : আমরা যখন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করি, তখন তার শেষে একটি স্বরধ্বনি ‘অ’-ও উচ্চারণ করি। যেমন, ‘ক’ কে উচ্চারণ করি (ক + অ =) ‘ক’। উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমরা এই কাজ করি। কিন্তু স্বরধ্বনি ছাড়া ‘ক’ উচ্চারণ করলে সেটা প্রকাশ করার জন্য ‘ক’-এর নিচে যে চিহ্ন (&) দেয়া হয়, তাকে বলে হস্ত / হল চিহ্ন। আর যে ধ্বনির পরে এই চিহ্ন থাকে, তাকে বলে হস্ত বা হল্প ধ্বনি। কোন বর্ণের নিচে এই চিহ্ন দেয়া হলে তাকে বলে হস্ত বা হল্প বর্ণ।

বাংলা বর্ণমালা : বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ আছে মোট ৫০টি। নিচে বর্ণমালা অন্যান্য তথ্য সহকারে দেয়া হলো-

স্বরবর্ণ											পূর্ণমাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন		
	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঝ	ঝ	়	ও	়ু*	ু*	৬	১	৮
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ								২	২	১
	চ	ছ	জ	ঝ	ঝ								৪	-	১
	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ								৪	১	-
	ত	থ	দ	ধ	ন								৩	২	-
	প	ফ	ব	ভ	ম								৪	১	-
	য	ৱ	ল										৩	-	-
	শ	ষ	স	হ									৩	১	-
	ড়	ঢ়	য়	ঁ									৩	-	১
	ঁ	ঁ											-	-	৩
মোট															
স্বরবর্ণ	১১	মোট	ব্যঞ্জনবর্ণ	৩১	মোট	৫০	পূর্ণ, অর্ধ ও মাত্রাহীন বর্ণ	৩২	৪				১০		

* এই দুটি স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনি বলে। কারণ, এই দুটি মূলত ২টি স্বরধ্বনির মিশ্রণ। যেমন- অ+ই = ঐ, অ+উ = ঔ বা ও+উ = ও। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মূলত ১৩টি।

বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ; কার ও ফলা : প্রতিটি স্বরবর্ণ ও কিছু কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ দুটো রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, স্বাধীনভাবে শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় অন্য কোন বর্ণে যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপে বা আশ্রিত রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘আ’ বর্ণটি ‘আমার’ শব্দের স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার ‘ম’-র সঙ্গে আশ্রিত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপেও (া) ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বরবর্ণের এই আশ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে কার, আর ব্যঞ্জনবর্ণের আশ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। উপরে ‘আমার’ শব্দে ‘ম’-র সঙ্গে যুক্ত ‘আ’-র সংক্ষিপ্ত রূপটিকে (া) বলা হয় আ-কার। এমনিভাবে ই-কার (w), ঈ-কার (x), উ-কার (y), ঊ-কার (~), ঝ-কার (ঢ), এ-কার (ঁ), প্রি-কার (^), ও-কার (ো), ঔ-কার(ৌ) কার। তবে ‘অ’ এর কোন কার নেই।

আবার আন্ত শব্দে 'ম'-র সঙ্গে 'র' সংক্ষিপ্ত রূপে বা ফলা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপটি (^a) র-ফলা। এরকম ম-ফলা (^{..}), ল-ফলা (^৷), ব-ফলা ([^]), ইত্যাদি।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ:

যৌগিক স্বরধ্বনি : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে তারা উচ্চারণের সময় সাধারণত একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হলে মিলিত স্বরধ্বনিটিকে বলা হয় যৌগিক স্বর, সম্মিলিত স্বর বা দ্বি-স্বর।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বর মোট ২৫টি। তবে যৌগিক স্বরবর্ণ মাত্র ২টি- প্রি, ও। অন্য যৌগিক স্বরধ্বনিগুলোর নিজস্ব প্রতীক বা বর্ণ নেই।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ:

উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

স্পর্শ ব্যঞ্জন : ক থেকে ম পর্যন্ত প্রথম ২৫ টি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস মুখগহবরের কোন না কোন জায়গা স্পর্শ করে যায়। এজন্য এই ২৫টি বর্ণকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনিগুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। ক, গ, চ, জ- এগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি। আর থ, ঘ, ছ, ঝ- এগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি।

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরূপিত হয়, অর্থাৎ গলার মাঝখানের উচ্চ অংশে হাত দিলে কম্পন অনুভূত হয়, তাদেরকে ঘোষ ধ্বনি বলে। আর যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরূপিত হয় না, তাদেরকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন, ক, থ, চ, ছ- এগুলো অঘোষ ধ্বনি। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এগুলো ঘোষ ধ্বনি।

উল্লঘননি বা শিশধ্বনি : শ, ষ, স, হ- এই চারটি ধ্বনি উচ্চারণের শেষে যতক্ষণ ইচ্ছা শ্বাস ধরে রাখা যায়, বা শিশ দেয়ার মতো করে উচ্চারণ করা যায়। এজন্য এই চারটি ধ্বনিকে বলা হয় উল্লঘননি বা শিশধ্বনি। এগুলোর মধ্যে শ, ষ, স- অঘোষ অল্পপ্রাণ, হ- ঘোষ মহাপ্রাণ।

ংঃ (বিসর্গ) : অঘোষ 'হ'-র উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনিই হলো 'ংঃ'। বাংলায় একমাত্র বিশ্বয়সূচক অব্যয়ের শেষে বিসর্গ ধ্বনি পাওয়া যায়। পদের মধ্যে 'ংঃ' বর্ণটি থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দুইবার হয়, কিন্তু 'ংঃ' ধ্বনির উচ্চারণ হয় না।

কম্পনজাত ধ্বনি- র : 'র' ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহবার অগ্রভাগ কম্পিত হয়, বা কাঁপে এবং দন্তমূলকে কয়েকবার আঘাত করে 'র' উচ্চারিত হয়। এজন্য 'র'-কে বলা হয় কম্পনজাত ধ্বনি।

তাড়নজাত ধ্বনি- ড় ও ঢ় : 'ড়' ও 'ঢ়' উচ্চারণের সময় জিহবার অগ্রভাগের নিচের দিক বা তলদেশ ওপরের দাঁতের মাথায় বা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এদেরকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। মূলত 'ড়' ও 'র' দ্রুত উচ্চারণ করলে যে মিলিত রূপ পাওয়া যায় তাই 'ড়' এর উচ্চারণ। একইভাবে 'ঢ়', 'ঢ়' ও 'ঢ়'-এর মিলিত উচ্চারণ।

পার্শ্বিক ধ্বনি- ল : ‘ল’ উচ্চারণের সময় জিহবার অগভাগ উপরের দাঁতের মাথায় বা দন্তমূলে ঠেকিয়ে জিহবার দু’পাশ দিয়ে বাতাস বের করে দেয়া হয়। দু’পাশ দিয়ে বাতাস বের হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি : গ, গ্র, ণ, ন, ম- এদের উচ্চারণের সময় এবং ০ঁ, ুঁ কোন ধ্বনির সঙ্গে থাকলে তাদের উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বাতাস বের হওয়ার সময় কিছু বাতাস নাক দিয়ে বা নাসারন্ক দিয়েও বের হয়। উচ্চারণ করতে নাক বা নাসিক্যের প্রয়োজন হয় বলে এগুলোকে বলা হয় আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি।

পরাশ্রয়ী বর্ণ : ০ঁ, ুঁ, ুঁ- এই ঢটি বর্ণ যে ধ্বনি নির্দেশ করে তারা কখনো স্বাধীন ধ্বনি হিসেবে শব্দে ব্যবহৃত হয় না। এই ধ্বনিগুলো অন্য ধ্বনি উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়। নির্দেশিত ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত না হয়ে পরের উপর আশ্রয় করে উচ্চারিত হয় বলে এই বর্ণগুলোকে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে।

নিচে স্পর্শধ্বনির (ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি) একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ছক আকারে দেয়া হলো-

নাম	উচ্চারণ প্রণালী	স্পর্শধ্বনি/ বর্গীয় ধ্বনি (বর্ণগুলো এই পর্যন্ত সীমিত)					নাসিক্য	অধোষ অংশ	অধোষ অংশ	ঘোষ অংশ				
		অধোষ		ঘোষ		অল্পপ্রাণ								
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ									
ক-বর্গীয় ধ্বনি (কর্ণ্য ধ্বনি)	জিহবার গোড়া নরম তালুর পেছনের অংশ স্পর্শ করে	ক	খ	গ	ঘ	ঙ								
চ-বর্গীয় ধ্বনি (তালব্য ধ্বনি)	জিহবার অগভাগ চ্যাপ্টা তাবে তালুর সামনের দিকে ঘষা থায়	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ্চ	য	য়	শ					
ট-বর্গীয় ধ্বনি (মুর্ধন্য ধ্বনি)	জিহবার অগভাগ কিছুটা উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ স্পর্শ করে	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ৱ	ড়	ঢ়	ষ				
ত-বর্গীয় ধ্বনি (দন্ত্য ধ্বনি)	জিহবা সামনের দিকে এগিয়ে ওপরের দাঁতের পাটির গোড়া স্পর্শ করে	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	ল	স					
প-বর্গীয় ধ্বনি (ওষ্ঠ্য ধ্বনি)	দুই ঠেঁটি বা ওষ্ঠ ও অধর জোড়া লেগে উচ্চারিত হয়	প	ফ	ব	ভ	ম								
							ঁ	ঁ	ঁ	হ				

- উল্লেখ্য, কর্ণ্য ধ্বনিকে জিহবামূলীয় এবং মূর্ধন্য ধ্বনিকে দন্তমূল প্রতিবেষ্টিত ধ্বনিও বলে।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য, র, ল, ব- এদেরকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয়। তবে অন্তঃস্থ ‘ব’ এখন আর বর্ণমালায় নেই, এবং এখন আর এটি শব্দে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। তবে ব্যাকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত সম্ভিতে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

কর্ণগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণ:

ক+ত = ক্ত	জ+ঞ্চ = জ্ঞ	ত+ত = ত্ত	ন+থ = ন্থ	র+ঞ্চ = র্ন	ষ+ম = ষ্ম	হ+ঞ্চ = হ্ন
-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------

ক+ষ = ষ্ট	ষ+জ = জি	ত+থ = থ	ন+ধ = ন্ধ	র+উ = রু	ষ+ণ = ষ্ণ	হ+ঁধ = হ
ক+ঁয = ক্য	ঁ+চ = ঁঁ	ত+ঁম = ঁম		ৱ+ধ = ঁধ	স+ৱ = ঁস	হ+ঁব = ঁহ
ক+ৱ = ক্র	ঁ+ছ = ঁছ	ত+ৱ = ত্র	ৱ+ধ = ঁধ	ল+ৱ = ঁল	স+ৱ = ঁস	হ+ৱ = ঁহ
গ+উ = গু	ট+ট = ট্র	ত+ৱ+উ = ত্রু	ভ+ৱ = ভ্র		স+ৱ = ঁস্ব	হ+ৱ = ঁহ
ঙ+গ = ঙ্গ	ণ+ড = ণ্ড	দ+য = দ্য	ভ+ৱ+উ = ভ্রু	শ+উ = শু	স+ত = স্তু	হ+ম = হ্ম
ঙ+ক = ঙ্ক		দ+ম = দ্ম	ম+ৱ = ঁম্ব	শ+ৱ+উ = শ্রু	স+য = স্য	
		দ+ধ = দ্ধ		শ+ৱ+উ = শ্রু	স+থ = স্থ	

ধ্বনি পরিবর্তন:

১. **আদি স্বরাগম :** শব্দের আদিতে বা শুরুতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম। যেমন, ‘স্কুল’ শব্দটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য শুরুতে ‘ই’ স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে ‘ইস্কুল’ হয়ে গেছে। এটি আদি স্বরাগম।
এরকম- > ইস্টিশন, স্ট্যাবল> আস্ট্রাবল, স্পর্ধা> আস্পর্ধা

২. **মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভঙ্গ :** শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনি আসলে তাকে বলে মধ্য স্বরাগম। যেমন, ‘রঞ্জ’ (র+অ+ত+ন+অ) শব্দের ‘ত’ ও ‘ন’-র মাঝখানে একটি অ যুক্ত হয়ে হয়েছে ‘রতন’। এটি মধ্য স্বরাগম। এরকম- ধর্ম> ধরম, স্বপ্ন> স্বপন, হর্ষ> হরষ, প্রীতি> পিরীতি, কিলিপ> ফিলিম, মুক্তা> মুকুতা, তুক> তুরুক, ক্র> ভুরু, গ্রাম> গেরাম, প্রেক> পেরেক, স্বেফ> সেরেফ, শোক> শোলোক, মুরগ> মুরোগ> মোরোগ,

৩. **অন্ত্যস্বরাগম :** শব্দের শেষে একটা অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসলে তাকে বলে অন্ত্যস্বরাগম। যেমন, ‘দিশ’-র সঙ্গে অতিরিক্ত ‘আ’ স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে হয়েছে ‘দিশা’। এরকম- পোক> পোক্ত, বেঞ্চ> বেঞ্ছি, সত্য> সত্তি

৪. **অপিনিহিতি :** পরের ‘ই’ বা ‘উ’ স্বরধ্বনি আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঙ্গস্বরনির আগে ‘ই’ বা ‘উ’ স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন, ‘আজি’ (আ+জ+ই) শব্দের ‘ই’ আগে উচ্চারিত হয়ে হয়েছে ‘আইজ’ (আ+ই+জ)। এরকম- সাধু> সাউধ, রাখিয়া> রাইখ্যা, বাক্য> বাইক্য, সত্য> সইত্য, চারি> চাইর, মারি> মাইর।

৫. **অসমীকরণ :** দুটো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন, ধপ+ধপ> (মাঝখানে একটি অতিরিক্ত আ যোগ হয়ে) ধপাধপ। এরকম- টপ+টপ> টপাটপ

৬. **স্বরসঙ্গতি :** দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার্থে একটির প্রভাবে আরেকটি পরিবর্তিত হলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, ‘দেশি’ (দ+এ+শ+ই)> (‘ই’-র প্রভাবে ‘এ’ পরিবর্তিত হয়ে ‘ই’ হয়ে) ‘দিশি’। স্বরসঙ্গতি ৫ প্রকার-

ক. প্রগত : আগের স্বরধ্বনি অনুযায়ী পরের স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, মুলো> মুলো, শিকে> শিকে, তুল> তুলো

খ. পরাগত : পরের স্বরধ্বনি অনুযায়ী আগের স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, আখে> আখুয়া> এখে, দেশি> দিশি

গ. মধ্যগত : অন্যান্য স্বরধ্বনির প্রভাবে মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, বিলাতি> বিলিতি

ঘ. অন্যোন্য : আগের ও পরের স্বরধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে যদি দুইটি-ই পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন, মোজা> মুজো

ঙ. চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি : গিলা> গেলা, মিলামিশা> মেলামেশা। মিঠা> মিঠে, ইছা> ইছে। মুড়া> মুড়ো, চুলা> চুলো। উড়ুনি> উড়নি, এখুনি> এখনি।

৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ বলে।

যেমন, ‘বসতি’ (ব+অ+স+অ+ত+ই) -র মাঝের ‘অ’ স্বরধ্বনি লোপ পেয়ে হয়েছে ‘বষ্টি’ (ব+অ+স+ত+ই)।

স্বরলোপ ৩ প্রকার-

ক. আদিস্বরলোপ : শব্দের শুরুর স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন, অলাবু> লাবু> লাউ, এড়ন্ড> (‘এ’ লোপ পেয়ে) রেড়ী, উদ্বার> উধার> ধার।

খ. মধ্যস্বরলোপ : শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন, অওরু> অগ্র, সুবণ> স্বর্ণ

গ. অন্তস্বরলোপ : শব্দের শেষের স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তস্বরাগম বলে। যেমন, আশা> আশ, আজি> আজ, চারি> চার, সন্ধ্যা> সঞ্চ্যা> সাঁৰ (স্বরলোপ স্বরাগম-এর বিপরীত প্রক্রিয়া।)

৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যবর্তী দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অদলবদল হলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন, বাক্স> বাস্ক, রিক্সা> রিষ্কা, পিশাচ> পিচাশ, লাফ> ফাল

৯. সমীভবন : (স্বরসঙ্গতির মতো, কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন হয়) দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন, ‘জন্ম’ (জ+অ+ন+ম+অ) -এর ‘ন’, ‘ম’-র প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ‘জন্ম’। সমীভবন মূলত ৩ প্রকার-

ক. প্রগত সমীভবন : আগের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, চক্র> চক, পক্ষ> পক্ছ, পদ্ম> পদ, লঘ> লঘ

খ. পরাগত সমীভবন : পরের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, তৎ+জন্য> তজ্জন্য, তৎ+হিত> তদ্বিত, উৎ+মুখ> উন্মুখ

গ. অন্যোন্য সমীভবন : পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে দুটিই পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন, সত্য (সংস্কৃত)> সক্ষ (প্রাকৃত), বিদ্যা (সংস্কৃত)> বিজ্ঞা (প্রাকৃত)

১০. বিষমীভবন : পাশাপাশি একই ব্যঞ্জনধ্বনি দু’বার থাকলে তাদের একটি পরিবর্তিত হলে তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন, শরীর> শরীল, লাল> লাল

১১. দ্বিষ্প ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিষ্পতা : শব্দের কোন ব্যঞ্জন দ্বিষ্প হলে, অর্থাৎ দুইবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিষ্প ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিষ্পতা বলে। মূলত জোর দেয়ার জন্য দ্বিষ্প ব্যঞ্জন হয়। যেমন, পাকা> পাক্ষা, সকাল> সক্ষাল

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : কোন ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন, কবাট> কপাট, ধোবা> ধোপা, ধাইমা> দাইমা

১৩. ব্যঞ্জনচূয়তি : পাশাপাশি দুটি একই উচ্চারণের ব্যঞ্জন থাকলে তার একটি লোপ পেলে তাকে বলে ব্যঞ্জনচূয়তি। যেমন, বড়দিদি> বড়দি, বড় দাদা> বড়দা,

১৪. অন্তর্হতি : কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন, ফাল্টন> ফাওন (‘ল’ লোপ), ফলাহার> ফলার, আলাহিদা> আলাদা

১৫. অভিশ্রুতি : যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়, এবং পরিবর্তিত স্বরধ্বনি তার আগের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়, এবং সেই মিলিত স্বরধ্বনির প্রভাবে তার পরের স্বরধ্বনিও পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন, ‘করিয়া’ (ক+অ+র+ই+য়+আ) থেকে অপিনিহিতির মাধ্যমে (র+ই-এর আগে আরেকটা অতিরিক্ত ‘ই’ যোগ হয়ে) ‘কইরিয়া’ হলো। অর্থাৎ অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ‘ই’ স্বরধ্বনিটির পরিবর্তন হলো। আবার ‘কইরিয়া’-এর র+ই-এর ‘ই’ তার আগের ‘ই’-র সঙ্গে মিলে গেলে হলো ‘কইরয়া’ বা ‘কইরা’। এবার ‘কইরা’-র ‘ই’ ও ‘আ’ পরিবর্তিত হয়ে হলো ‘করে’। এটিই অভিশ্রুতি। এরকম, শুনিয়া-> শুইনিয়া-> শুইনা-> শুনে, বলিয়া-> বহলিয়া-> বহলা, হাটুয়া-> হাটুটা-> হেটো, মাছুয়া-> মাটুছুয়া-> মাটুছা-> মেছো।

১৬. র-কার লোপ : (আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত) শব্দের ‘র’ ধ্বনি বা ‘র-কার’ লোপ পেয়ে প্রবর্তী ব্যঙ্গন দ্বিষ্ট হলে তাকে র-কার লোপ বলে। যেমন, তক-> তক, করতে-> কতে, মারল-> মালল, করলাম-> কলাম।

১৭. হ-কার লোপ : (আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত) অনেক সময় দুইটি স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ‘হ’ ধ্বনি বা ‘হ-কার’ লোপ পায়। একে হ-কার লোপ বলে। যেমন, ‘গাহিল’ (গ+আ+হ+ই+ল+অ)-এর ‘আ’ ও ‘ই’ স্বরধ্বনি দুটির মধ্যবর্তী ‘হ’ লোপ পেয়ে হয়েছে ‘গাইল’। এরকম, পুরোহিত-> পুরুত, চাহে-> চায়, সাধু-> সাহ> সাউ, আল্লাহ-> আল্লা, শাহ-> শা

১৮. অ-শ্রতি ও ব-শ্রতি : পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে, এবং সেই দুটি স্বরধ্বনি মিলে কোন যৌগিক স্বর তৈরি না করলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য মাঝে একটি অন্তঃস্থ ‘য়’ বা অন্তঃস্থ ‘ব’ উচ্চারিত হয়। একে অ-শ্রতি ও ব-শ্রতি বলে। যেমন, ‘যা+আ’, এখানে পরপর দুটি ‘আ’ স্বরধ্বনি আছে। দুটি যুক্ত হয়ে কোন যৌগিক স্বর তৈরি করছে না। তাই এখানে মাঝখানে একটি অন্তঃস্থ ‘য়’ উচ্চারিত হয়ে হবে ‘যাওয়া’। এরকম, নাওয়া, থাওয়া, দেওয়া।

শব্দ

শব্দ ভাষার প্রশ্বর্যময় সম্ভার। এই প্রশ্বর্যময় শব্দসম্ভারে অর্থবোধক শব্দই হচ্ছে বস্তু, ভাব বা অনুভূতির প্রতীক। এই প্রতীকের সাহায্যে রচিত হয় বাক্য। শব্দের অর্থ বৈচিত্র্যের জন্য তার ক্রম ও ক্রমান্তর সাধন করা হয়। এভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য শব্দ তৈরী করার প্রক্রিয়াকে এক কথায় শব্দ গঠন বলা হয়।

অতএব, যেসব বীভিত্তিতে সাধিত শব্দ গঠিত হয় সেসব বীভিত্তিকে শব্দ গঠন বীভিত্তি বলে।

শব্দ গঠন:

বিভিন্ন ভাবে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার গড়ে উঠেছে। গঠন পদ্ধতির দিক থেকে প্রধানত ৪ ভাগে বাংলা শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

- ক. উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন,
- খ. প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন,
- গ. সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন,
- ঘ. সম্মিলন সাহায্যে শব্দ গঠন।

■ উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন:

যেসব অব্যয় কৃদ্রষ্ট বা নাম শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সে শব্দগুলোর অর্থের প্রসার, সংকোচন বা নানাবিধি পরিবর্তন সাধন করে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে তাদের উপসর্গ বলে। উপসর্গ স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না এবং এগুলো নিজের কোন অর্থ প্রকাশ করতে পরে না। উপসর্গ অন্য শব্দের পূর্বে বসে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ প্রকাশ করে। যার জন্য একই উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রকাশ করে। সে জন্য বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা ভাষার উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১. সংস্কৃত উপসর্গ, ২. খাঁটি বাংলা উপসর্গ এবং ৩. বিদেশী উপসর্গ।

১. সংস্কৃত উপসর্গ: অনেক সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তিত না হয়ে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এগুলোকে সংস্কৃত উপসর্গ বলে। সংস্কৃত উপসর্গ মোট ২০টি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির, দুর, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন:

প্র	প্রকার, প্রগতি, প্রজন্ম, প্রণাম, প্রতাপ, প্রদক্ষিণ, প্রত্যেক, প্রকৃষ্ট, প্রয়োগ, প্রভাব ইত্যাদি।
পরা	পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাকার্তা, পরাগ, পরামর্শ, পরাজিত, পরাবর্তিত, পরাক্রম, পরাহত ইত্যাদি।
অপ	অপকার, অপব্যয়, অপমৃত্যু, অপকর্ম, অপঘাত, অপরাত, অপগত, অপচয়, অপবাদ, অপলাপ, ইত্যাদি।
সম	সম্মতি, সম্প্রতি, সম্ভাষণ, সংগীত, সংস্কার, সম্পদান, সংক্ষেপ, সংগ্রহ, সঞ্চার, সংঙ্গ, সংবাদ, সম্মান।
অনু	অনুসার, অনুপাত, অনুরাগ, অনুকার, অনুরোধ, অনুগ্রহ, অনুক্রম, অনুসা, অনুপাত, অনুমান, অনুবাদ।
অব	অবস্থা, অবতার, অবদান, অবগত, অবনত, অবলম্বন, অবসর, অবজ্ঞা, অবরোধ, অবকাশ, অবহেলা।
নির	নিরপরাধ, নিরন্তন, নিরভিমান, নিরতিশয়, নির্গম, নির্দেশ, নির্দয়, নির্জন, নির্মল, নির্ভয়, নির্ণয় ইত্যাদি।
দুর	দুর্জয়, দুর্ভাগ্য, দুর্ভুতি, দুর্জন, দুরাশা, দুর্ভিক্ষ, দুর্দিন, দুর্যোবহার, দুর্গম, দুর্গতি, দুর্বার, দুর্মীতি ইত্যাদি।
অভি	অভিমুখ, অভুত্থান, অভিযোগ, অভিসার, অভিশাপ, অভিনয়, অভিধান, অভিভূত ইত্যাদি।
বি	বিয়োগ, বিজয়, বিজন, বিনয়, বিষম, বিস্তৃত, বিখ্যাত, বিত্রুষা, বিকাশ, বিগ্রহ, বিচার, বিধান।
অধি	অধিপতি, অধীশ্বর, অধিগত, অধ্যাত্ম, অধ্যায়স, অধিষ্ঠান, অধিনায়ক, অধিকার, অধিবাস, অধিবেশন।
সু	সুন্দর, সুচারু, সুপেয়, সুশ্রী, সুকোমল, সুফলা, সুনাম, সুগম, সুতীক্ষ্ণ, সুস্থ, সুভা, সুভাষ, সুলভ, সুন্দিন।
উৎ	উৎকর্তা, উৎকর্ণ, উৎসর্গ, উৎপাদন, উৎকর্ষ, উৎকোচ, উৎক্ষেপ, উদ্দেশ্য, উৎপন্ন, উৎসব, উচ্চারণ।
অতি	অতিমানব, অতিক্রম, অতিকায়, অত্যল্প, অতীন্দ্রিয়, অত্যাচার, অতিশয়, অত্যন্ত, অতিরিক্ত ইত্যাদি।
নি	নিকৃষ্ট, নিবৃত্তিনিবাস, নির্গম, নিশ্চয়, নিবারণ, নিরোগ, নিকট, নিমজ্জন, নিচয়, নিদান, নিপাত, নিয়োগ।
প্রতি	প্রতিকার, প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া, প্রতীক্ষা, প্রতিনিধি, প্রতীক, প্রতিফল, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ইত্যাদি।
পরি	পরিধান, পরিহাস, পরিণত, পরিচয়, পরিপূর্ণ, পরিপাক, পরিবর্তন, পরিশিষ্ট, পরিণাম ইত্যাদি।
অপি	অপিনিহিতি, অপিধান, অপিনন্দ, অপিচ ইত্যাদি।
উপ	উপকথা, উপক্রম, উপনদী, উপসাগর, উপত্যকা, উপগ্রহ, উপজাত, উপদেশ, উপনিবেশ, উপকার।
আ	আক্রমন, আগমন, আবেশ, আদেশ, আরষ্ট, আদান, আকর্ষ, আকর, আকার, আতপ, আসমুদ্র, আশৰ্য।

২. খাঁটি বাংলা উপসর্গ: সংস্কৃতে যেমন ২০টি উপাদান আছে, বাংলাতেও তেমনি বেশ কয়েকটি উপসর্গের প্রচলন দেখা যায়। তবে সংস্কৃত উপসর্গে সাথে বাংলা উপসর্গের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সংস্কৃত উপসর্গ ধাতুর

পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থকে বদলে দেয়। তাই শব্দের অর্থও বদলে যায়। কিন্তু বাংলা উপসর্গগুলো সরাসরি শব্দের আগে বসে এবং নতুন শব্দ গঠন করে। বাংলা উপসর্গ অ-তৎসম শব্দের আগে বসে। থাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি। যথা: অ, অজ, অঘা, অনা, আ, আন, আড়, আৰ, ইতি, উন, কুম কুদ, নি, পাতি, বি, ভৱ, রাম, স, সা, সু, হা ইত্যাদি।

থাঁটি বাংলা উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন:

অ	অমিল, অকাজ, অবেলা, অপয়া, অজানা, অচিন, অঘোর, অঘোর, অমানুষ, অথই, অতল, অসীম, অসুন্দর, অবেলা, অশান্তি, অফুরন্ত, অদেখা, অযাত্রা, অব্যয়, অপাত্র, অযথা, অসুবিধা, অবাঙালি, অনড়, অঙ্গি, অপয়া, অকেজো, অনামী ইত্যাদি।
অজ	অজমুর্থ, অজপাড়াগাঁ ইত্যাদি।
অঘা	অঘাটী, অঘারাম ইত্যাদি।
অনা	অনাবৃষ্টি, অনামুখো, অনাসৃষ্টি, অনাদায়, অনাদর ইত্যাদি।
আ	আকাটা, আধোয়া, আসিন্দ, আভাজা, আঘাটা, আকাল, আগাছা, আলুনি, আমূল, আভাঙা, আকাঁড়া।
আন	আনমনা, আনকোরা, আনচান, আনসেলাই ইত্যাদি।
আড়	আড়নয়ন, আড়চোখ, আড়পাগল, আড়মোড়া ইত্যাদি।
আৰ	আৰডাল, আৰছায়া ইত্যাদি।
ইতি	ইতিহাস, ইতিকথা, ইতিকর্তব্য ইত্যাদি।
উন	উনপাঁজুরে, উনবিংশ, উনভাত, উনবৰ্ষা ইত্যাদি।
কু	কুকথা, কুচিন্তা, কুমুকি, কুঅভ্যাস, কুজন ইত্যাদি।
কদ	কদাকার, কদবেল, কর্দ্য, কদাচার ইত্যাদি।
নি	নিখরচা, নিখাদ, নির্জলা, নির্ভেজাল, নির্ভরসা, নিভাঁজ, নিটোল, নিখুঁত, নিলাজ, নিষ্কল, নিষ্ঠার, নিবাস।
পাতি	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতিকুয়া ইত্যাদি।
বি	বিদেশ, বিকাল, বিফল, বিকল, বিসদৃশ, বিজন, বিয়োগ, বিৱৰণ, বিদেশী, বিজোড়, বিপথ, বিভুঁই ইত্যাদি।
ভৱ	ভৱসঁাৰ, ভৱদিন, ভৱদুপুৱ, ভৱবেলা, ভৱপেট, ভৱসন্ধ্যা ইত্যাদি।
রাম	রামছাগল, রাপদা, রামশিথা, রামপাঁঠা, রামকেলী, রামশালীক, রামদোলাই ইত্যাদি।
স	সবল, সলাজ, সৱৰ, সঠিক, সুপত্র, সঞ্চীক, সজল, সটাল, সদেখ, সকাতৱ, সঞ্চম ইত্যাদি।
সা	সাজোয়ান, সামৱিক, সমান্ত, সামৰ্থ, সামগ্ৰী ইত্যাদি
সু	সুসময়, সুনজৱ, সুখবৱ। গুদিন, সুলভ ইত্যাদি।
হা	হা-ঘৱে, হাভাতে, হাহতাশ, হাহাকার, হাপিতোশ ইত্যাদি।

৩. বিদেশী উপসর্গঃ বাংলা উপসর্গের মত বিদেশী উপসর্গগুলোও শব্দের আগে বসে। যেমন:

ফি	ফিবাৰ, ফিৰোজ, ফিদিন, ফিবছৱ, ফিষিন ইত্যাদি।
হৱ	হৱৰোজ, হৱদিন, হৱসাল, হৱবেলা ইত্যাদি।
গ্ৰ	গ্ৰহজম, গ্ৰহনাজি, গ্ৰহহাজিৱ, হৱমিল ইত্যাদি।
হেড	হেড-চাপৱাশী, হেড-প-ংত, হেড-অফিস, হেড-মিস্ট্ৰী ইত্যাদি।
না	নাবালক, নামঞ্জুৱ, নারাজ, নাকাল, নাচার, নাছোড়বাল্দা ইত্যাদি।
ব	বকলম, বনাম, বমাল ইত্যাদি।

বদ	বদরাগী, বজ্জাত, বদমেজাজী, বদমাইস, বদনাম, বদনসিব, বদগন্ধ, বদখেয়াল, বদভ্যাস।
ফুল	ফুলহাতা, ফুলটিকিট, ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট, ফুলটাইম, ফুলবাবু ইত্যাদি।
হাফ	হাফ-হাতা, হাফ-টাইম, হাফ-শার্ট, হাফ-প্যান্ট, হাফ-নেতা ইত্যাদি।
সাব	সাব-জজ, সাব-রেজিস্ট্রার, সাব-অফিস ইত্যাদি।
নিম	নিমরাজী, নিমমুখ, নিম-হাকিম, নিম-মোল্লা ইত্যাদি।
বর	বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত, বরখেলাপ ইত্যাদি।
কার	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি ইত্যাদি।
খাস	খাসকামরা, খাসমহল ইত্যাদি।
খোস	খোসগল্প, খোসমেজাজ, খোসগন্ধ ইত্যাদি।
দৱ	দরখাস্ত, দরপতনী, দরদালান, দরপাট্টা ইত্যাদি।

■ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় বহু শব্দের ও ধাতু (ক্রিয়ার মূল) ব্যবহার আছে। কিন্তু একই মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে কোন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। অতএব, যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। যেমন:

ক. শব্দের শেষে: হাত + ডিভি (প্রত্যয়) = হাতুডিভি; ঢাকা + আই (প্রত্যয়) = ঢাকাই ইত্যাদি।

খ. ধাতুর শেষে: ক্ (ধাতু) + তব্য (প্রত্যয়) = কর্তব্য; চল (ধাতু) + অন্ত (প্রত্যয়) = চলন্ত ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা: ১. কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় এবং ২. তদ্বিতীয় প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয়।

১. **কৃৎ প্রত্যয়:** ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন: ক + আ = করা, চল + অন্ত = চলন্ত, মাত্র + আল = মাতাল ইত্যাদি।

২. **বাংলা কৃৎপ্রত্যয়:** বাংলা ভাষায় অনেক ধাতু রয়েছে, যেগুলো প্রকৃত ভাষা থেকে এসেছে। এসব ধাতুর সাথে প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত কিছু প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয় বলে।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন:

‘০’ শূন্য প্রত্যয়: ধাতুর উত্তর যে-কোন প্রত্যয় না হয়ে অর্থ ‘অ’ বা শূন্য প্রত্যয় যোগে নাম শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ বা বিশেষণ ক্লপে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ঝুল + অ = ঝুল, মা + ০ = মা।

কাদ + অ = কাঁদ	‘অ’ প্রত্যয়:
পড + অ = পড়	
মুড় + অক = মোড়ক	‘অক’ প্রত্যয়:
ফাট + অক = ফাটক	
বৈঠ + অক = বৈঠক	
চড় + অক = চড়ক	
সড় + অক = সড়ক	

চট + অক = চটক	
র্কি + অত = ফেরত	‘অত’ প্রত্যয়ঃ
বস + অত = বসত	
মান + অত = মানত	
জান + অত = জানত	
হাজ + অত = হাজত	
চল + অন = চলন	‘অন’ প্রত্যয়ঃ
বাঁধ + অন = বাঁধন	
মাজ + অন = মাজন	
বেল + অন = বেলন	
কুল + অন = কুলন	
গা + অন = গাওনা	
যা + অন = যাওনা	
দে + অনা = দেনা	‘অনা’ প্রত্যয়ঃ
গা + অনা = গাওনা	
বাট + অনা = বাটনা	
দোল + অনা = দোলনা	
রাঁধ + অনা = রান্না	
গাহ + অনা = গাওনা	
যাচ + আই = যাচাই	‘আই’ প্রত্যয়ঃ
বড় + আই = বড়াই	
মির্ঠ + আই = মির্ঠাই	
বাছ + আই = বাছাই	
লড় + আই = লড়াই	
চড় + আও = চড়াও	‘আও’ প্রত্যয়ঃ
পাকড় + আও = পাকড়াও	
ঝি + আও = ঘেরাও	
দোল + আও = দোলাও	
মান + আন = মানান	‘আন’ প্রত্যয়ঃ
জান + আন = জানান	
ভাস + আন = ভাসান	
চাল + আন = চালান	
পড় + ই = পড়ি	‘ই’ প্রত্যয়ঃ
হাস + ই = হাসি	
থা + ই = থাই	
যা + ই = যাই	
ডুব + আরি = ডুবারি	‘আরি’ প্রত্যয়ঃ
কাট + আরি = কাটারি	
ধনু + আরি = ধুনারি	

পূজ + আরি = পূজারি	
সাঁত + আরু = সাঁতারু	‘আরু’ প্রত্যয়ঃ
ডুব + আরু = ডুবারু	
খুঁজ + আরু = খোঁজারু	
ভোজ + আরু = ভোজারু	
ব্রাথ + আল = রাথাল	‘আল’ প্রত্যয়ঃ
ব্রাত + আল = মাতাল	
ব্রিশ + আল = মিশাল	
মিশ + আল = মিশালী	‘আলি’ প্রত্যয়ঃ
রাথ + আল = রাথালি	
‘ইয়া > ইয়ে’ প্রত্যয়ঃ	
কহ + ইয়া = কহইয়া > কইয়ে	
কাঁদন + ইয়া = কাঁদনিয়া > কাঁদুনে	
বাজ + ইয়ে = বাজিয়ে	
থাট + অনি = থাটনি	‘অনি’ প্রত্যয়ঃ
ঢাক + অনি = ঢাকনি	
জ্বল + অনি = জ্বলনি	
বাঁধ + অনি = বাঁধনি	
ছাক + অনি = ছাকনি	
চাহ + অনি = চাহনি	
কাঁপ + অনি = কাঁপনি	
গাঁথ + অনি = গাঁথনি	
ব্রচল + অন্ত = চলন্ত	‘অন্ত’ প্রত্যয়ঃ
ব্রজীব + অন্ত = জীবন্ত	
ব্রফুট + অন্ত = ফুটন্ত	
ব্রভাস + অন্ত = ভাসন্ত	
ব্রউঠ + অন্ত = উঠন্ত	
ব্রবাড + অন্ত = বাড়ন্ত	
ব্রপড + অন্ত = পড়ন্ত	
ব্রডুব + অন্ত = ডুবন্ত	
পিছ + অল = পিছল	‘অল’ প্রত্যয়ঃ
ফাট্ট + অল = ফাটল	
জি + অল = জিঅল	
হি + অল = হিজল	
ধ + আ = ধরা	‘আ’ প্রত্যয়ঃ
দেখ + আ = দেখা	
কাট + আ = কাটা	

হাম্ + আ = হামা	
বাধ্ + আ = বাধা	
ঠডাক্ + উ = ডাকু	‘উ’ প্রত্যয়ঃ
ঠউড্ + উ = উড়-	
ঠঝড্ + উ = ঝড়-	
থাড্ + উ = থাড়-	
মিশ্ + উক = মিশুক	‘উক’ প্রত্যয়ঃ
হিংসা + উক = হিংসুক	
চুম্ + উক = চুমুক	
পড্ + উক = পড়-ক	
ডুব্ + উরী = ডুবুরী	‘উরী’ প্রত্যয়ঃ
ধন্ + উরী = ধনুরী	
পডু + উয়া = পড়ুয়া	‘উয়া’ প্রত্যয়ঃ
চল্ + উয়া = চলুয়া	
সাজ্ + উয়া = সাজুয়া	
থা+ উয়া = থাওয়া	
থট্ + কা = থটকা	‘কা’ প্রত্যয়ঃ
হেঁচ্ + কা = হেঁচকা	
কেঁচ্ + কা = কেঁচকা	
মট্ + কা = মটকা	
মুড্ + কি = মুড়িক	‘কি’ প্রত্যয়ঃ
সড্ + কি = সড়কি	
মুচ্ + কি = মুচকি	
ফি + তা = ফিরতা	‘তা’ প্রত্যয়ঃ
জান্ + তা = জানতা	
পড্ + তা = পড়তা	
ধ্ + তা = ধরতা	
চল্ + তি = চলতি	‘তি’ প্রত্যয়ঃ
উঠ্ + তি = উঠতি	
কম্ + তি = কমতি	
বাড্ + তি = বাড়তি	
বাট্ + না = বাটনা	‘না’ প্রত্যয়ঃ
ঢাক্ + না = ঢাকনা	
শুক্ + না = শুকনা	
রাঁধ্ + না = রান্না	
কাদ্ + না = কান্না	

খ. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ঃ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে আগত বহু শব্দ আছে। এসব শব্দ সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে। সাধুর সাথে যেসব প্রত্যয় যোগ হয় সেগুলোকে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে। সংস্কৃত কৃৎ

প্রত্যয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় পরিবর্তিত রূপ পেয়েছে। সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় যোগ হয়ে বিশেষ বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন:

ঠ/গ্ম + অনীয় = গমনীয়	‘অনীয়’ প্রত্যয়ঃ
ঠ/দ্ব + অনীয় = দশনীয়	
বর + অনীয় = বরণীয়	
ঠ/ক + অনীয় = করণীয়	
স্মর + অনীয় = স্মরণীয়	
ঠ/ক + তব্য = কর্তব্য	‘তব্য’ প্রত্যয়ঃ
মনু + তব্য = মন্তব্য	
গম + তব্য = গন্তব্য	
বক + তব্য = বক্তব্য	
দা + তব্য = দাতব্য	
ভবি + তব্য = ভবিতব্য	
বস + অ = বাস	‘অ’ প্রত্যয়ঃ
লাভ + অ = লাভ	
দহ + অ = দাহ	
নশ + অ = নাশ	
পর্ণ + অ = পার	
যগ + অ = যাগ	
ভ্রম + তি = ভ্রান্তি	‘তি’ প্রত্যয়ঃ
শম + তি = শান্তি	
ভজ + তি = ভক্তি	
যুত + তি = যুক্তি	
মুচ + তি = মুক্তি	
বচ + তি = উক্তি	
দীপ + তি = দীপ্তি	
দৃশ + তি = দৃষ্টি	
জ্ঞ + তি = জ্ঞাতি	
কৃ + তি = কৃতি	
শক + তি = শক্তি	
গম + তি = গতি	
মন + তি = মতি	
হা + তি = হাতি	
জন + অক = জনক	‘অক’ প্রত্যয়ঃ
গৈ + অক = গায়ক	
পোষ + অক = পোষক	
নৈ + অক = নায়ক	
কৃ + অক = কারক	

নৃত + অক = নর্তক	
পাল + অক = পালক	
পার্থ + অক = পার্থক	
ভক্ষ + অক = ভক্ষক	
সাধ্য + অক = সাধক	
ভজ + অন = ভজন	‘অন’ প্রত্যয়ঃ
ক + অন = করণ	
গম + অন = গমন	
শী + অন = শয়ন	
দা + অন = দান	
পা + অন = পান	
বি + ধা + তা = বিধাতা	‘তা’ প্রত্যয়ঃ
বী + তা = নেতা	
শ্র + তা = শ্রেতা	
ক + তা = কর্তা	
দা + তা = দাতা	
জি + তা = জেতা	
বচ + তা = বক্তা	
দৃশ + তা = দ্রষ্টা	
হন + তা = হন্তা	
ম + ত = মৃত	‘ত’ প্রত্যয়ঃ
ভী + ত = ভীত	
গম + ত = গত	
ভূ + ত = ভূত	
দৃশ + ত = দৃষ্ট	
মুচ + ত = মুক্ত	
পূজ + ত = পূজিত	
উৎ + নস + ত = উন্নত	
ক + ত = কৃত	
শুধ + ত = শুধিত	
মুহ + ত = মুঝ	
শী + ত = শায়িত	
সুন + ত = সুপ্ত	
ভিদ + ত = ভিন্ন	
গণ + ত = গণিত	
ভিদ + ত = ভিন্ন	

৩. তদ্বিত প্রত্যয়ঃ শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্বিত প্রত্যয় বলে। যেমন:
ঢাকা + আই = ঢাকাই, লাঠি + আল = লাঠিয়াল, জের্তা + আমি = জের্তামি ইত্যাদি।

তদ্বিতি প্রত্যয়কে আবার তিনি ভাগ করা যায়; যথা: ক. বাংলা তদ্বিতি প্রত্যয়, খ. সংস্কৃত তদ্বিতি প্রত্যয় এবং গ. বিদেশী তদ্বিতি প্রত্যয়।

ক. বাংলা তদ্বিতি প্রত্যয়: সংস্কৃত ও বিদেশী প্রত্যয়ের বাইরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব তদ্বিতি প্রত্যয়গুলোকে বাংলা তদ্বিতি প্রত্যয় বলে। এ প্রত্যয় যোগে বিশেষ বা বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

‘অই’ প্রত্যয়ঃ	
পাঁচ + অই = পাঁচই	দশ + অই = দশই
‘অক’ প্রত্যয়ঃ	
দোল + অক দোলক	চড় + অক = চড়ক
সড় + অক = সড়ক	চোল + অক = চোলক
নোল + অক = নোলক	
‘অট’ প্রত্যয়ঃ	
সাপ + অট = সাপট	ভ + অট = ভরাট
জমা + অট = জমাট	মলা + অট = মলাট
দাপ + অট = দাপট	তুল + অট = তুলট
‘আন’/‘অনো’ প্রত্যয়ঃ	
হাত + আন = হাতান	জুতা + আন = জুতান
পেঁচ + আনো = পেঁচানো	
‘আমি’ প্রত্যয়ঃ	
ঝ + আমি = ঘরামি	বাঁদর + আমি = বাঁদরামি
ছেলে + আমি = ছেলেমি	
‘অড়’ প্রত্যয়ঃ	
পাক + অড় = পাকড়	তুথ + অড় = তুথড়
চাপ + অড় = চাপড়	ভাঙ + অড় = ভাঙড়
‘আর’/‘আরি’ প্রত্যয়ঃ	
ছুতা + আর = ছুতার	কাঁস + আরি = কাঁসারি
লোহ + আর = লোহার	শাঁখ + আরি = শাঁখারি
সোন + আর = সোনার	ভিথ + আরি = ভিথারি
পূজা + আরি = পূজারি	
‘অন’ প্রত্যয়ঃ	
দাঁত + অন = দাঁতন	নানা + অন = নানান
মাজ + অন = মাজন	মত + অন = মতন
পাঁচ + অন = পাঁচন	পিছ + অন = পিছন
‘আল’/‘আলি’ প্রত্যয়ঃ	
পাঁক + আল = পাঁকাল	মিতা + আলি = মিতালি
ধা + আল = ধারাল	সোন + আলি = সোনালি
দুধ + আল = দুধাল	মেয়ে + আলি = মেয়েলি
তেজ + আল = তেজাল	
‘অল’ প্রত্যয়ঃ	
আদ + অল = আদল	বাউ + অল = বাউল

তাত্ + অল = তাতল	দীঘ + অল = দীঘল
বাদ্ + অল = বাদল	হাত্ + অল = হাতল
‘ই’ প্রত্যয়ঃ	
চালাক্ + ই = চালাকি	বড় মানুষ + ই = বড় মানুষি
আমি + ই = আমিনি	ডাকাত + ই = ডাকাতি
নবাব + ই = নবাবি	বাহাদুর + ই = বাহাদুরি
‘আ’ প্রত্যয়ঃ	
গো + আ = গোরা	বাঘ + আ = বাঘা
কাল্ + আ = কালা	রাম্ + আ = রামা
ফাঁক + আ = ফাঁকা	শ্যাম + আ = শ্যামা
বাঁক + আ = বাঁকা	চাষ + আ = চাষা
খাল + আ = খালা	চীন + আ = চীনা
‘ঈ’ প্রত্যয়ঃ	
কাজ্ + ঈ = কাজী	হিসাব + ঈ = হিসাবী
দরদ্ + ঈ = দরদি	আলাপ + ঈ = আলাপী
দাম্ + ঈ = দামী	
‘আই’ প্রত্যয়ঃ	
চাটা + আই = চাটাই	কান্ + আই = কানাই
মাল + আই = মালাই	মোগ্ন + আই = মোগলাই
মিঠ + আই = মিঠাই	চো + আই = চোরাই
রাম + আই = রামাই	পাটনা + আই = পাটনাই
ঢাকা + আই = ঢাকাই	লড়া + আই = লড়াই
‘জাত’ প্রত্যয়ঃ	
গৃহ + জাত = গৃহজাত	বাজার + জাত = বাজারজাত
গোলা + জাত = গোলাজাত	
‘পনা’ প্রত্যয়ঃ	
গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা	সতী + পনা = সতীপনা
‘পিছু’ প্রত্যয়ঃ	
ঘর + পিছ = ঘরপিছ	মাথা + পিছ = মাথাপিছু
‘ময়’ প্রত্যয়ঃ	
বাড়ি + ময় = বাড়িময়	দেশ + ময় = দেশময়
‘সই’ প্রত্যয়ঃ	
মানান্ + সই = মানানসই	যুৎ + সই = যুৎসই
‘আচ’ প্রত্যয়ঃ	
ছা + আচ = ছাঁচ	কানা + আচ = কানাচ
ছেঁয়া + আচ = ছেঁয়াচ	মানা + আচ = মানাচ
‘আচি’ প্রত্যয়ঃ	
বেঙ + আচি = বেঙাচি	ঠঁং + আচি = ঠঁঙাচি

খ. সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়ঃ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সাথে তদ্বিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয় বলে। যেমন:

‘অ (ঝ) প্রত্যয়ঃ	
কুক্ত + ঝ = কৌরব	স্মৃতি + ঝ = স্মার্ত
পুত্র + ঝ = পৌত্র	ব্যাকরণ + ঝ = বৈয়াকরণ
বিষ্ণু + ঝ = বৈষ্ণব	তিল + ঝ = তৈল
দেব + ঝ = দৈব	গুরু + ঝ = গৌরব
পশ্চ + ঝ = পাশব	শিশু + ঝ = শৈশব
মধুর + ঝ = মাধুর	বন্ধু + ঝ = বান্ধব
‘ইত’ প্রত্যয়ঃ	
ফল + ইত = ফলিত	স্ফুর্ধা + ইত = স্ফুর্ধিত
দুঃখ + ইত = দুঃখিত	
‘ইল’ প্রত্যয়ঃ	
জটা + ইল = জটিল	ফেন্ট + ইল = ফেনিল
পক্ষ + ইল = পক্ষিল	
‘ইন’ প্রত্যয়ঃ	
সুখ + ইন = সুখিন	পাপ + ইন = পাপী
ধন + ইন = ধনী	বল + ইন = বলী
জ্ঞান + ইন = জ্ঞানী	
‘বিন’ প্রত্যয়ঃ	
মেধা + বিন = মেধাবী	তাপস + বিন = তপস্বী
তেজস + বিন = তেজস্বী	
ই (ঝি) প্রত্যয়ঃ	
দশরথ + ঝি = দাশরথি	সুমিত্রা + ঝি = সৌমিত্রি
রাবণ + ঝি = রাবণি	
‘ইষ্ট’ প্রত্যয়ঃ	
গুরু + ইষ্ট = গরিষ্ঠ	লঘু + ইষ্ট = লঘিষ্ঠ
ষ (ঝ্য) প্রত্যয়ঃ	
দিতি + ঝ্য = দৈত্য	প্রাচী + ঝ্য = প্রাচ
আদিতি + ঝ্য = আদিত্য	গ্রাম + ঝ্য = গ্রাম্য
কবি + ঝ্য = কাব্য	গো + ঝ্য = গব্য
সুন্দর + ঝ্য = সৌন্দর্য	বাণিক + ঝ্য = বাণিজ্য
ঈশ্বর + ঝ্য = প্রিশ্বর্য	সভা + ঝ্য = সভ্য
বীর + ঝ্য = বীর্য	সেনা + ঝ্য = সৈন্য
‘তর’ প্রত্যয়ঃ	
লঘু + তর = লঘুতর	মহৎ + তর = মহত্তর
গুরু + তর = গুরুতর	বৃহ + তর = বৃহত্তর
‘তম’ প্রত্যয়ঃ	
লঘু + তম = লঘুতম	স্ফুর্দ্র + তম = স্ফুর্দ্রতম

‘ময়’ প্রত্যয়ঃ	
স্বর্গ + ময় = স্বর্গময়	বাক + ময় = বাকময়
ধাতু + ময় = ধাতুময়	চি + ময় = চিময়
জল + ময় = জলময়	
এয় (ষেয়) প্রত্যয়ঃ	
ভগিনী + ষেয় = ভাগিনেয়	অতিথি + ষেয় = আতিথেয়
গঙ্গা + ষেয় = গাঙ্গেয়	অঞ্জি + ষেয় = আঞ্জেয়
মতুপ (মৎ), বতুপ (বৎ) প্রত্যয়ঃ	
ভঙ্গি + মতুপ = ভঙ্গিমান	জ্ঞান + বতুপ = জ্ঞানবান
‘তন’ প্রত্যয়ঃ	
পুরা + তন = পুরাতন	চির + তন = চিরপ্তন
পূর্ব + তন = পূর্বতন	
ঙৈয় (ঞীয়) প্রত্যয়ঃ	
শাস্ত্র + ঞীয় = শাস্ত্রীয়	স্বর্গ + ঞীয় = স্বর্গীয়
আঞ্চা + ঞীয় = আঞ্চীয়	জাত + ঞীয় = জাতীয়
‘তা’ প্রত্যয়ঃ	
চিতুর + তা = চতুরতা	কাতর + তা = কাতরতা
সৎ + তা = সত্তা	মধুর + তা = মধুরতা
ঈন প্রত্যয়ঃ	
পূর্বকাল + ঈন = পূর্বকালীন	সম্মুখ + ঈন = সম্মুখীন
ঞিয় (ইক) প্রত্যয়ঃ	
দিন + ঞিয় = দৈনিক	দর্শন + ঞিয় = দাশনিক
লোক + ঞিয় = লৌকিক	তর্ক + ঞিয় = তার্কিক
দেব + ঞিয় = বৈদিক	
‘ইমন্’ প্রত্যয়ঃ	
প্রিয় + ইমন্ = প্রেমন্ (প্রেম)	গুরু + ইমন্ = গরিমা
মহৎ + ইমন্ = মহিমা	লঘু + ইমন্ = শঘিমা
নীল + ইমন্ = নীলিমা	
‘শালিন’ প্রত্যয়ঃ	
ধন + শালিন = ধনশীল	শক্তি + শালিন = শক্তিশালী
‘ল’ প্রত্যয়ঃ	
কুশ + ল = কুশল	শ্যাম + ল = শ্যামল
মাংস + ল = মাংসল	শীত + ল = শীতল
‘শস্’ প্রত্যয়ঃ	
ক্রম + শস্ = ক্রমশ	প্রায় + শস্ = প্রায়শ
‘য, প্রত্যয়ঃ	
ধন + য = ধন্য	অতিথি + য = অতিথ্য
ন্যায় + য = ন্যায্য	
‘বৎ’ প্রত্যয়ঃ	

পিতৃ + বৎ = পিতৃবৎ	প্রাত্ + বৎ = প্রাত্ৰবৎ
আঘ + বৎ = আঘবৎ	বিষ + বৎ = বিষবৎ
জল + বৎ = জলবৎ	

গ. **বিদেশী তদ্বিত প্রত্যয়:** শব্দের সঙ্গে যেসব বিদেশী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে বিদেশী তদ্বিত প্রত্যয় বলে। যেমন:

‘আনা/আনি’ প্রত্যয়ঃ	
বাবু + আনা = বাবুয়ানা	মুন্ডি + আনা = মুন্ডিয়ানা
হিন্দু + আনি = হিন্দু	গরিব + আনা = গরিবানা
‘দান/দানি’ প্রত্যয়ঃ	
বাতি + দান = বাতিদান	কলম + দানি = কলমদানি
আনি কন্যা + দান = কন্যাদান	নিমক + দান = নিমকদানি
ছাই + দানি = ছাইদানি	ফুল + দান = ফুলদান
পিক + দানি = পিকদানি	ধূপ + দানি = ধূপদান
‘ওয়ান’ প্রত্যয়ঃ	
গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান	দার + ওয়ান = দারোয়ান
কোচ + ওয়ান = কোচোয়ান	
‘খানা’ প্রত্যয়ঃ	
ছাপা + খানা = ছাপাখানা	বৈঠক + খানা = বৈঠকখানা
মুদি + খানা = মুদীখানা	কার + খানা = কারখানা
ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা	পিল + খানা = পিলখানা
‘চা/চি’ প্রত্যয়ঃ	
বাগ + চ = বাগিচা	ডেঙ + চি = ডেগচি
মশাল + চি = মশালচি	ব্যাঙ + চি = ব্যাঙচি
‘সই’ প্রত্যয়ঃ	
মান + সই = মানসই	জুত + সই = জুতসই
প্রমাণ + সই = প্রমাণসই	টেক + সই = টেকসই
চলন + সই = চলনসই	মানান + সই = মানানসই
‘খোর’ প্রত্যয়ঃ	
সুদ + খোর = সুদখোর	ঘূষ + খোর = ঘূষখোর
নেশা + খোর = নেশাখোর	গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর
হারাম + খোর = হারামখোর	গুলি + খোর = গুলিখোর
‘নবিশ’ প্রত্যয়ঃ	
পত্র + নবিশ = পত্রনবিশ	শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ
নকল + নবিশ = নকলনবিশ	হিসাব + নবিশ = হিসাবনবিশ
‘গিরি’ প্রত্যয়ঃ	
বাবু + গিরি = বাবুগিরি	পন্ডিত + গিরি = পন্ডিতগিরি
কেরানী + গিরি = কেরানীগিরি	মাঝি + গিরি = মাঝিগিরি
দাদা + গিরি = দাদাগিরি	সর্দার + গিরি = সর্দারগিরি

নেতা + গিরি = নেতাগিরি	হাকিম + গিরি = হাকিমগিরি
‘বন্দী’ প্রত্যয়ঃ	
জনাব + বন্দী = জবাববন্দী	বাক্স + বন্দী = বাক্সবন্দী
‘স্থান’ প্রত্যয়ঃ	
বেলুচ + স্থান = বেলুচস্থান	তুর্কি + স্থান = তুর্কিস্থান
কুর্দি + স্থান = কুর্দিস্থান	পাকি + স্থান = পাকিস্থান
‘বাজ/বাজী’ প্রত্যয়ঃ	
চাল + বাজ = চালবাজ	গলা + বাজি = গলাবাজ

■ **সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন:** ভাষা ব্যবহার করতে দুই বা অধিক সংখ্যক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দসমষ্টিকে প্রায় ব্যবহার করতে হয়। এসব শব্দ সমষ্টি সমাস হিসেবে পরিচিত। সুতরাং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। সমাসের যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহসন, রাজাৰ পুত্ৰ = রাজপুত্ৰ ইত্যাদি।

‘সমাস’ শব্দের প্রকৃত অর্থ একত্র অবস্থান বা সংক্ষেপণ। সুতরাং বাংলা ভাষায় সমাসের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা। সেজন্য বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য। কারণ সমাসের সাহায্যে নতুন নতুন শব্দ তৈরী হয়ে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। সমাস অল্প কথায় অধিক ব্যঙ্গনা দান করে। সমাস ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, সংক্ষেপণ ও ক্ষতিমাধুর্য আনয়ন করে ভাষাকে গতিময়তা দান করে। সুতরাং বাংলা শব্দ গঠনে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: ১. দ্বন্দ্ব সমাস, ২. দ্বিগু সমাস, ৩. কর্মধারয় সমাস, ৪. তৎপুরুষ সমাস, ৫. অব্যয়ীভাব সমাস এবং ৬. বহুব্রীহি সমাস।

সমাসযোগে শব্দ গঠনের উদাহরণঃ

১. দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠনঃ

ভাল ও মন্দ = ভালমন্দ	হাট ও বাজার = হাটবাজার
মাতা ও পিতা = মাতাপিতা	ছোট ও বড় = ছোটবড়
গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য	সোনা ও কল্পা = সোনাকল্পা
ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে	কোলে ও পির্ঠে = কোলেপির্ঠে
বৃক্ষ ও লতা = বৃক্ষলতা	জমা ও খরচ = জমাখরচ
হাতি ও ঘোড়া = হাতিঘোড়া	গান ও বাজনা = গানবাজনা

২. দ্বিগু সমাস যোগে শব্দ গঠনঃ

ত্রি (তিন) ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ	চৌ (চার) রাষ্ট্রার সমাহার = চৌরাষ্ট্রা
সাত সমুদ্রের সমাহার = সাতসমুদ্র	পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ
শত অঙ্গের সমাহার = শতাঙ্গী	তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ	

৩. কর্মধারয় সমাস যোগে শব্দ গঠনঃ

মহান যে ঝৰি = মহঝৰি	নীল যে উৎপল = নীলোৎপল
---------------------	-----------------------

পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র	রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি
আগে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোথিত	পতিত হয়ে মৃত্যু = পতিতমৃত্যু
বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ	যিনি দেব তিনি ঋষি = দেবর্ষি
মহৎ যে জন = মহাজন	কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা
রক্ত যে চন্দন = রক্তচন্দন	যে হষ্ট সেই পুষ্টি = হষ্টপুষ্টি
ঘরে পালিত জামাই = ঘরজামাই	শোক রূপ অনল = শোকানল

৪. তৎপুরুষ সমাস যোগে শব্দ গঠন:

ছেলেকে ভুলানো = ছেলে ভুলানো	পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত
ব্রহ্ম হতে অঙ্ক = ব্রহ্মাঙ্ক	পথের রাজা = রাজপথ
পুরুষের উত্তম = পুরুষোত্তম	হংসের রাজা = রাজহংস
বিলাত হতে ফিরত = বিলাতফেরত	বিয়ের জন্য পাগল = বিয়েপাগল
বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন	ধামা ধরে যে = ধামাধরা

৫. অব্যয়ীভাব সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন:

কর্তৃর সমীপে = উপকর্তৃ	বনের সদৃশ্য = উপবন
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ	মিলের অভাব = গরমিল
দিলে দিলে = প্রতিদিল	পা হতে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক
ভাতের অভাব = হাভাতে	কর্তৃ পর্যন্ত = আকর্তৃ
অক্ষীর সমীপে = প্রত্যক্ষ	হায়ার অভাব = বেহায়া

৬. বহুব্রীহি সমাস যোগে শব্দ গঠন:

শূল পাণিতে যার = শূলপাণি	পীত অশ্঵র যার = পীতাশ্঵র
অহংকার নাই যার = নিরহংকারী	উর্ণ নাভিতে যার = উর্ণনাভ
লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধ = লাঠালাঠি	মৃগের মত নয়ন যার = মৃগনয়না
নেই তার যার = বেতার	সম্মান তীর্থ (গ্রন্থ) যার = সতীর্থ
আশীতে বিষ যার = আশীবিষ	নদী মাতা যার = নদীমাত্রক
পাপে মতি যার = পাপমতি	নেই বোধ যার = অবোধ
জলের সাথে বিদ্যমান = সজল	চাঁদের মত মুখ যার = চাঁদমুখ

■ সন্ধির যোগে শব্দ গঠন

অতি নিকটবর্তী দুটি শব্দের পরস্পর মিলনের ফলে একটি নতুন সংমিশ্রনের সৃষ্টি হয়। এ সংমিশ্রনের নাম সন্ধি। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। অতএব, দুটি বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত পরস্পর সন্ধিহিত হলে যুগপৎ উচ্চারণের ফলে ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে সন্ধি বলে।

সন্ধির ফলে পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলন ঘটে এবং তাতে উচ্চারণ খুব সহজ, শ্রুতিমধুর ও কম সময় সাপেক্ষে হয়। সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয় এবং তাতে ভাষার শব্দভাস্ত্বার সমৃদ্ধ হয়। সুতরাং বলা যায় ভাষাকে সহজ, সমৃদ্ধ, শ্রুতিমধুর এবং গতিশীল করার জন্য সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরীসিম।

তিনভাবে সম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন করা যায়। যথা:

১. স্বরসম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন,
২. ব্যঞ্জনসম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন এবং
৩. বিসর্গ সম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন।

১. স্বরসম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন:

এক + উন = একোন	পরি + কার = পরিষ্কার
সম + গম = সংগম	নর + অধম = নরাধম
নব + অল্প = নবাল্প	মহা + প্রশ্বর্য = মহৈশ্বর্য
নব + উত্তা = নবোত্তা	সম + জীবনী = সঙ্গীবনী
উৎ + স্থান = উত্থান	হিম + আলয় = হিমালয়
শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক	পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
উত্তম + ধূণ = উত্তমণ	ষট্ট + মাস = ষষ্ঠাম
সম + কার = সংস্কার	সিংহ + আসন = সিংহাসন
অন্য + অন্য = অন্যান্য	নৈ + অক = নায়ক
তথা + এবচ = তথৈবচ	শম + কর = শক্তর

২. ব্যঞ্জনসম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন:

উৎ + হত	= উদ্বিত
মহিমা + অশ্বিত	= মহিমাশ্বিত
দিক + অন্ত	= দিগন্তস্থ + থ = স্থষ্ট
রবি + ইন্দ্র	= রবীন্দ্র
ষট্ট + আনন	= ষড়ানন

৩. বিসর্গ সম্মিলিত সাহায্যে শব্দ গঠন:

গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র	উৎ + লেখ = উল্লেখ
জীবৎ + দশা = জীবদ্বশা	অধঃ + গতি = অধোগতি
নিঃ + চয় = নিশ্চয়	ঢাকা + সৈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী
যতী + ইন্দ্র = যতীন্দ্র	চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
পৃথি + সৈশ = প্রথিশ	নর + উত্তম = নরোত্তম
বিপদ + চিত্তা = বিপচ্ছিতা	মৃৎ + ময় = মৃন্ময়
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ
নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র	ফল + উদয় = ফলোদয়
বিপদ + জনক = বিপজ্জনক	উদ + মত = উন্মত্তি
ইতৎ + তত = ইত্যস্তত	অন্তঃ + আস্তা = অন্তরাস্তা
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা	চল + উর্মি = চলোর্মি
কুৎ + ঘটিকা = কুস্তিকা	সম + দর্শন = সন্দর্শন
মনঃ + যোগ = মনোযোগ	নিঃ + অবধি = নিরবধি
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	সম + তান = সন্তান

সংখ্যাবাচক শব্দ:

সংখ্যাবাচক শব্দ : সংখ্যা বলতে গণনার ধারণা বোঝায়।

যে সব শব্দ কোন বিশেষ পদ, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা কোন কিছুর সংখ্যার ধারণা প্রকাশ করে, তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। যেমন- এক টাকা, দশটা আম, ইত্যাদি।

প্রকারভেদ : সংখ্যাবাচক শব্দ ৪ প্রকার-

১. অক্ষবাচক সংখ্যা
২. পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা
৩. ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা
৪. তারিখবাচক সংখ্যা

১. **অক্ষবাচক সংখ্যা** : কোন কিছুর সংখ্যা বা পরিমাণ অক্ষে বা সংখ্যায় লিখলে তাকে বলে অক্ষবাচক সংখ্যা।

যেমন- ১ টাকা, ১০টি গরম্ব।

অর্থাৎ, অক্ষবাচক সংখ্যা হলো- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ইত্যাদি।

২. **পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা** : কোন কিছুর সংখ্যা বা পরিমাণ অক্ষে না লিখে ভাষায় লিখলে তাকে পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা বলে। যেমন- এক টাকা, দশটি গরম্ব।

অর্থাৎ, **পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা** হলো- এক, দই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বার, ইত্যাদি।

পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা নিচে দেখানো হলো-

এক গুণ = একে। যেমন- সাতকে সাত

দুই গুণ = দু গুণ। যেমন- পাঁচ দু গুণ দশ

তিন গুণ = তিনিকে। যেমন- তিন তিনিকে নয়

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক ‘সংখ্যা শব্দ’ : পূর্ণসংখ্যার চেয়েও কম বা বেশি বোঝাতে কিছু সংখ্যাবাচক শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলোও সংখ্যার নির্দিষ্ট ধারণাকে বোঝায়। এবং কোন সংখ্যার সাহায্যে না লিখে এগুলোকে ভাষায় ব্যবহার করা হয় বলে এগুলোও পরিমাণ বা গণনাবাচক শব্দ। যেমন-

(ক) ন্যূনতা বাচক সংখ্যা শব্দ

চৌথা, সিকি বা পোয়া = এক এককের চারভাগের এক ভাগ

তেহাই = এক এককের তিনভাগের এক ভাগ

অর্ধ বা আধা = এক এককের দুইভাগের এক ভাগ

আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ = এক এককের আটভাগের এক ভাগ

এরকম, চার ভাগের তিন বা তিন চতুর্থাংশ, পাঁচ ভাগের এক বা এক পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি।

পোয়া = কোন এককের চার ভাগের তিন অংশকে তার পরবর্তী এককের পোয়া অংশ বলে। অর্থাৎ,

(খ) আধিক্যবাচক সংখ্যা শব্দ

সওয়া -

দেড় -আধা কম দুই -

আড়াই - আধা কম তিন -

৩. ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ : একই সারি, দল বা শ্রেণীতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে যে সংখ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ বলে। যেমন- প্রথম ছেলে, দশম গরু।

অর্থাৎ, ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ হলো- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, ইত্যাদি।

৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাদের তারিখবাচক শব্দ বলে। যেমন- পহেলা বৈশাখ, চৌদ্দই ফাল্গুন।

বাংলা তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি (১-৪) হিন্দি নিয়মে গঠিত। বাকিগুলো অবশ্য বাংলার নিজস্ব নিয়মেই গঠিত হয়েছে।

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে অঙ্কবাচক, পরিমাণ বা গণনাবাচক, ক্রম বা পূরণবাচক ও তারিখবাচক শব্দগুলো দেখানো হলো-

অঙ্ক বা সংখ্যা বাচক শব্দ	পরিমাণ বা গণনা বাচক শব্দ	ক্রম বা পূরণ বাচক শব্দ	তারিখবাচক শব্দ
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিনি	তৃতীয়	তেসরা
৪	চারি	চতুর্থ	চোরা
৫	পাঁচি	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়ি	ষষ্ঠি	ছড়ই
৭	সাতি	সপ্তম	সাতই
৮	আটি	অষ্টম	আটই
৯	নয়ি	নবম	নউই
১০	দশি	দশম	দশই
১১	এগারি	একাদশ	এগারই
১২	বারি	দ্বাদশ	বারই
১৩	তেরি	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দি	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনেরি	পঞ্চদশ	পনেরই
১৬	ষোলি	ষষ্ঠিদশ	ষোলই
১৭	সতেরি	সপ্তদশ	সতেরই
১৮	আঠারি	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	উনিশি	উনবিংশ	উনিশই
২০	বিশি	বিংশ	বিশে
২১	একুশে	একবিংশ	একুশে

*ছকটা ভালো করে দেখে কোনটি কোন শব্দ তা মনে রাখা জরুরি।

বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

ভাষার অন্যতম মৌলিক উপাদান শব্দ। বিশেষ বা স্বতন্ত্র পদার্থ বা ভাবকে প্রকাশ করে, মানব-মুখনিঃসূত এমন একটি ধ্বনিকে বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে শব্দ বলে। এক বা একাধিক ধ্বনির অবলম্বনে শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন: এ, এই, শোন, মা, কে, তুই, চাঁদ, হাত, আলো ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, “অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে।”

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, “অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ বলে। কোন বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে, সেই সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।”

অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, “এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরী অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।”

যে ভাষার শব্দভান্ডার যতো বেশি সমৃদ্ধ সে ভাষা ততো উল্লত। ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। প্রতিটি জীবন্ত ভাষার রয়েছে অসংখ্য শব্দ। ভাষা-বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিটি জীবন ভাষা দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বাভাবিক নিয়মে আহরণ করে নতুন নতুন শব্দ। এ সব শব্দ পুরনো শব্দের সঙ্গে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া যে কোন ভাষার সূজনশীল কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় নতুন নতুন শব্দ সূজন করে নিজস্ব ভাষাশৈলী গঠন করেন, পরবর্তীকালে ত্রি সকল শব্দ ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দের অর্থভূক্ত হয়ে যায়। নতুন ভাষা সূজন মুহূর্তেও কোন ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় কথনও সরাসরি কথনও পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দই ফারসি ও জার্মান, ল্যাটিন ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে অনেক শব্দ। এভাবে ভাষার ভান্ডারে নিত্য-নতুন শব্দের জন্ম হয়।

আমাদের বাংলা ভাষাও দেশী-বিদেশী অসংখ্য শব্দ আহরণ করে সমৃদ্ধশালী ভাষার পরিণত হয়েছে। ইল্লো-ইউরোপীয় মূল ভাষাশৈলীর প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাথার ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা বর্তমানে রূপ লাভ করেছে। তাই এ ভাষায় দেশী-বিদেশী অসংখ্য শব্দের উপস্থিতি বিদ্যমান। আর্যরা এদেশে আগমনের পূর্বে যেসব আদিম অধিবাসি এখানে বসবাস করত তারাও কিছু শব্দ দান করেছে। বিদেশীরা ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম প্রচার, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে এদেশে এসেছে এবং বসবাস করেছে। তাদের ভাষার শব্দ সমূহ এদেশের ভাষার ওপর প্রভাব ফেলেছে। এভাবে মৌচাকে মধু সঞ্চয়ের পদ্ধতিতে, বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সম্ভার গৃহীত হয়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষা। বিভিন্ন ভাষার প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষার সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর পরিচয় বের করাও কষ্টকর হয়ে পরে।

■ শব্দের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ, খ. অর্থানুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ এবং গ. গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ।

■ উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ

উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. **তৎসম শব্দ:** ‘তৎ’ অর্থ তার (সংস্কৃতের) আর ‘সম’ অর্থ সমান। অর্থাৎ ‘তৎসম’ শব্দটির অর্থ হলো সংস্কৃতের সমান। যেসব সংস্কৃত শব্দ কোন প্রকার বিকৃত না হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে আসছে,

সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, “প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল-অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অক্ষর অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাংলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ।”

তৎসম শব্দ গাণ্ডীর্যপূর্ণ। তাই গুরুগন্তীর ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। প্রচীনকাল থেকে এদেশের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষায় চলতে থাকায় বাংলা ভাষার প্রয়োজন মত বহু সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করেছে। দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মতে বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের প্রচলন রয়েছে শতকরা পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্পিশের মত। যেমন: চন্দ, মস্তক, গৃহিণী, পঞ্জ, পত্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, মৃত্যু, অঞ্চল, হস্ত, চরণ, সূর্য, মনুষ্য, ভক্তি, আতিথ্য, মঞ্জুর, গমন, ফল, ফুল, লতা, ধর্ম, কর্ম, লাভ, ক্ষতি, শয়ন, গমন, ভোজন, সিংহ, লবণ, দ-, জিহ্বা, চর্ম, অদ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, নীর, নারী, ব্যক্তি, দস্যু, দাস, সভা, শুশুর, ধন, ধৰ্ণ, বন্ধু, আগমন, শক্তি, মুক্তি, জয়, পরাজয়, সন্ধ্যা, পুষ্প, কৃষ্ণ, নিমন্ত্রণ, শ্রাদ্ধ, স্পর্শ, ঘর্ষণ, জ্ঞান, জ্ঞাপন, যন্ত্র, রন্ধন, জ্যোৎস্না, তমশা, কর্ণ, কান্না, বৎস, কাক, কল্য, কাংস্য, কঙ্কন, কেশর, শরীর, জন্ম, পর্বত, রাত্রি, জীবিকা, শয়ন, চক্ষু, জনক, সাগর, প্রবেশ, গগন, জলধি, ছাত্র, শিক্ষা, রাজা, মানব, বৎস, সন্তান, জননী, স্মৃতি, নদ, নদী, পদ্ম, প্রশংসন, নৃত্য, বর্ষা, গ্রাম, বন, কন্যা, অস্ত্র, রণ, যুদ্ধ, জীবন, অমৃত, রবি, শশী, প্রস্তুত, পথ, ভূমি, সঞ্চয়, সমর, নতুন, নির্গমন, সিন্ধু, ঢাল, তাপস, জল, বণিক, ব্রাহ্মণ, নৌকা, কৃপণ, ক্ষমতা, ক্ষমা, দীক্ষিত, বধূ, পুণ, প্রস্থান ইত্যাদি।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের মনে রাখার কৌশল:

হস্তে যদি থাকে শক্তি

চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র করবে ভক্তি

ভবনের পত্র ধর্ম

লাভ ক্ষতি মনুষ্য পর্বতের কর্ম

সন্ধ্যায় করোনা ভোজন শয়ন গমন।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ: যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দকে অবিকৃত নেই; অথচ পূর্ণ তদ্বক্তৃপেও প্রাপ্ত হয়নি, লোকের মুখে শৃঙ্খলাবীনভাবে ভেঙে খুব সহজে উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলা হয়। ‘কৃষ্ণ’ একটি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ। এটি প্রকৃত বা অপ্রকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় তদ্বক্তৃপে কালহাই, কানাই বা কানু ক্লপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটি আবার লোক মুখে বিকৃত হয়ে অর্ধ-তৎসম শব্দ কেষ্ট হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শতকরা ৫ ভাগশব্দই অর্ধ-তৎসম শব্দ। যেমন: গতর (তৎসম- গাত্র, তদ্বক্তৃ-গা), নেমন্তন্ত্র (তৎসম-নিমন্ত্রণ), ছেরাদ (তৎসম-শ্রাদ্ধ), বেরাক্ষণ (তৎসম-ব্রাহ্মণ), আদা (তৎসম-আদ্রক), ক্ষিদে (তৎসম-ক্ষুধা), গিন্ধী (তৎসম-গৃহিণী), মচ্ছব (তৎসম-মহোৎসব), পুরুত (তৎসম-পুরোহিত), বোষ্টম (তৎসম-বৈষ্ণব), মাগগী (তৎসম-মহার্ষ), আঁধার (তৎসম-অন্ধকার), হাঁস (তৎসম-হংস), কুমার (তৎসম-কুন্তকার), কামার (তৎসম-কর্মকার), সোনা (তৎসম-স্বর্ণ), লোহ (তৎসম-লোহ), চোখ (তৎসম-চক্ষু), জোছনা (তৎসম-জ্যোৎস্না), ঘেঁঘা (তৎসম-ঘৃণা), পেঁঘাম (তৎসম-প্রণাম), ছাতা (তৎসম-ছত্র), গাধা (তৎসম-গর্দভ), সত্যি (তৎসম-সত্য), গেরস্ত (তৎসম-গৃহস্ত), যতন (তৎসম-যন্ত্র), চামার (তৎসম-চর্মকার), রাত্রির (তৎসম-রাত্রি), বিষ্টি (তৎসম-বৃষ্টি), সূর্যি (তৎসম-সূর্য), গতর (তৎসম-গাত্র), মিষ্টি (তৎসম-মিষ্টি), রতন (তৎসম-রন্ধন), রোদুর (তৎসম-রৌদ্র), বিছির (তৎসম-বিশ্বি), পির্ঠ (তৎসম-পৃষ্ঠ), কুচ্ছিত (তৎসম-কুৎসিত), কিছু (তৎসম-কিছু), বাতি (তৎসম-বার্তিকা), সোয়াদ (তৎসম-স্বাদ), মন্তর (তৎসম-মন্ত্র), সকল (তৎসম-সকল), প্ররান (তৎসম-প্রাণ), পরশ (তৎসম-স্পর্শ), পীরিত (তৎসম-প্রীতি), তেষ্টা (তৎসম-তৃষ্ণা), বাদ্যি (তৎসম-বাদ্য) ইত্যাদি।

কিছু অর্ধ তৎসম শব্দের মনে রাখার কৌশল:

গিন্নী জ্যোষ্ঠা কুচিত গতরে বোষ্টমের বাড়িতে নেমন্তন থেতে যান, পুরুত ও কেষ্ট খিদে পেয়ে আদা থান।

৩. তদ্ব শব্দ: যেসব শব্দ মূল সংস্কৃত অথচ কালক্রমে প্রকৃত ভাষার মধ্যে পড়ে লোকের মুখে বিকৃতপ্রাপ্ত হয়ে রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, সেগুলোকে তদ্ব শব্দ বলে। মূলীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, “যেসব শব্দ মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ব শব্দ।”

তদ্ব কথাটির অর্থ তৎ (তা) থেকে ভব (উৎপন্ন), অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থেকে উৎপন্ন। বাংলা ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে এগুলো গ্রহণ করেছে। ড, এনামুল হকের মতে খ্যাতনামা লেখকদের রচনায় শতকরা ষাট ভাগই তদ্ব শ্রেণীর অর্ণগত। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় নাম, পেশাবাচক শব্দ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক বস্তুর নাম, ঘর-সংসারের জিনিসপত্র, সংখ্যাবাচক শব্দ, তারিখ, ক্রিয়াবাচক শব্দ, অব্যয় ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ তদ্ব শ্রেণীভূক্ত। এ শব্দগুলো বর্ণবিন্যাসে, বাহ্য আকৃতিতে, উচ্চারণে এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থের দিক থেকে এমনভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে যে এগুলো এখন আর সংস্কৃত শব্দ বলে মনে হয় না। যেমন: কর্ণ সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত রূপ হচ্ছে কল্প। এ ‘কল্প’ শব্দ থেকেই ‘কান’ তদ্ব শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। নিচে তদ্ব শব্দের পরিবর্তন ধারার কতিপয় নমুনা দেওয়া হল:

সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা(তদ্ব)	সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা(তদ্ব)	সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা(তদ্ব)
সন্ধ্যা > সঞ্চা > সাঁঁা	হস্ত > হথ > হাত	সৰ্ব > সব > সব
মৃত্তিকা > মিত্তিকা > মাটি	প্রাণ্ত > ভুল্ল > ভুল	পত্র > পত > পাত
ঘটিকা > ঘডিআ > ঘড়ি	বক্ষ > বংক > বাঁক	তক্ষ > টক্ষা > টাকা
চন্দ্র > চন্দ্র > চাঁদ	অদ্য > অঞ্জ > আজ	মাতা > মাত্তা > মা
দধি > দহি > দই	পাদ > পাতা > পা	সন্তার > সংতার > সাঁতার
বক্ষঃ > বুক্থ > বুক	ঘাত > ঘাত > ঘা	অঞ্চল > অংচল > আঁচল
বাটী > বাড়ী > বাড়ি	ভদ্র > ভল্ল > ভাল	ঘিত > ঘিত্তা > ঘি
চলিত > চলই > চলে	দ-> দন্ত > দাঁত	অর্ধ > অন্ধ > আধ
বধু > বহ > বউ	গাত্র > গাত্তা > গা	কার্য > কঞ্জ > কাজ
সীতা > সীথা > সিঁথি	সথি > সহি > সই	চক্র > চক > চাক
পায়াণ > পাবন > পাহাড়	বৃক্ষ > বুক্ষ > বুড়া	অক্ষি > অক্ষিথ > আঁখি
গটু > ঘটু > ঘাট	অভ্যন্তর > ভীতর > ভিতর	সন্ধ্যা > সঞ্চা > সাঁঁা
কর্ণ > কল্প > কান	নৃত্য > নাষ্টা > নাচ	মধু > মহ > মৌ
কার্য > কঞ্জ > কাজ	মৎস্য > মচ > মাছ	সৰ্ব > সক্র > সব
ভঙ্গ > ভও > ভাত	মাত্র > মাই > মা	তেল > তেল্ল > তেল

তদ্ব শব্দের কিছু উদাহরণ: গোয়াল, গৱ, ঘোড়া, উট, হাতি, গাধা, সাপ, সোনা, রূপা, আম, ছাতা, লাঠি, বাতি, হাত, পা, চোখ, কান, এক, দুই, তিন, পোয়া, সাড়ে, দেড়, আধ, মা, বাপ, ভাই, বোন, মামা, জ্যাঠা, কামার, বাঁদর, ভাত, ভাপ, মেয়ে, মড়ক, মাস, রাখাল, শিউলি, কুমার, পয়লা, দোসরা, পাঁচই, আমি, তুমি, তিনি, চলে, হয়, নাচে, কাল, ভালো, হালকা, পাতলা, বাচ্চুর, বাঁৰা (বাঁজা), আজ, আলতা, আটপোরে, দেউলিয়া, দেউটি, উনুন, এয়ো, ওঝা, চিড়া, ছুতা, ছাতা, জট, ঝি ইত্যাদি।

তত্ত্ব শব্দের মনে রাখার কৌশল:

আখি আজ করেছে কাজ
মৌ পরেছে বিয়ের সাজ
বৌমা এনেছে ভাত মাছ
মাথায় হাত কানে দাত
চাদ সই করা তত্ত্বের কাজ।

৪. **থাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশী শব্দ:** যেসব শব্দ অতি প্রাচীনকাল হতেই এদেশে প্রচলিত হয়ে আসছে, আর্য সভ্যতার প্রভাবে লোপ পায় নি বা বিকৃত ঘটে নি, বর্তমান সময়ের প্রচলিত আছে, সেগুলোকে দেশী শব্দ বলে। যেসব শব্দ দ্রাবিড়, কোন অথবা এদেশের আদিম অধিবাসী অর্নায়দের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে সেগুলোকে থাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশী শব্দ বলে।

থাঁটি বাংলা শব্দ বা দেশী শব্দ সম্পর্কে মূলীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেছেন, “বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের যেমন: কোল, মুন্ডা প্রভৃতি ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রাখ্তি আছে। এসব শব্দকে দেশী শব্দ নামে অবহিত করা হয়। অনেক শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হিসেব মেলে। যেমন: কুড়ি (বিশ)-কোল ভাষা, পেট (উদর)-তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)-মুন্ডারী ভাষা।”

ড. হমায়ুন আজাদ বলেছেন, “বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূলনির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয়েছে যে, উত্তরের আগে যে-সব ভাষা ছিল আমাদের দেশে, সে-সব ভাষা থেকেই এসেছে এই শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় ‘দেশী শব্দ’। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশী বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকে গ্রহণ করা উচিত বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙা, টেল, ডাঙা, ঝোল, টেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী করে বিদেশী বলি।”

এদেশে আর্যরা আগমনের পূর্বে কোল, মুন্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি অর্নায় জাতির বসবাস ছিল। আর্যদের প্রভাবে তারা প্রভাবাত্ত্বিত হলেও কিছু শব্দ তারা আর্যদের উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষায় শতকরা দুইটি শব্দ এ উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। দেশী শব্দের মধ্যে কিছু অর্নায় শব্দ এবং কিছু অজ্ঞাত শব্দও রয়েছে যার মূল জানা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়েনি। বাংলার পূর্ববর্তী প্রাকৃত ভাষায় এগুলো প্রবেশ করে এবং পরে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে। কতিপয় দেশী শব্দ: টেকি, টোল, কাটা, খোঁপা, ডিঙি, কুলা, টোপর, খোকা, খুকি, বাথারি, কড়ি, ঝিঙা, কয়লা, কাকা, খবর, খাতা, কামড়, কলা, গয়লা, চঙ্গ, চাউল, ছাই, ঝাল, ঝোল, ঠাটা, ডাগর, ডাহা, টিল, পয়লা, চুলা, আজ্ঞা, ঝানু, ঝোঁপ, ডাঁসা, ডাব, ডাঙর, খোঁড়া, চোঙা, ছাল, টিল, ঝিঙা, মাঠ, মুড়ি, কালা, বউ, চাটাই, খোঁজ, চিংড়ি, কাতলা, ঝিলুক, মেকি, নেড়া, কুলা, ঝাটা, মই, বাদুব, বক, কুকুর, তেতুল, গাঁদা, শিকড়, খেয়া, লাঠি, ডাল, কলাকে, ঝাপসা, কঢ়ি, ছুটি, ঘূম, দৰ, গোড়া, ইতি, যাঁতা, চোঙা, খড়, পেট, কুড়ি, দোয়েল, খবর, খোঁচা, গলা, গোড়া, গঞ্জ, ধূতি, নেকা, বোবা, একটা ইত্যাদি।

দেশি শব্দ মনে রাখার কৌশল:

এক গঙ্গের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় দিয়ে চোঙা হাতে পেটের আলায় চুলা কুলা ডাব ও ডিংগা নিয়ে টং এর মাচায় উঠল।

অথবা, ইমন মার্ঠ থেকে টোপৰে কৱে ঝিঞ্চে তুলে চোঙ্গওয়ালা ডিঙ্গায় কৱে গঞ্জে যায়। সেখান থেকে কুড়ি টাকায় কুলা, পাতিল, হাড়ি, মই, টেঁকি, ঝাঁটা, ডাব, ছাই কিনে বাড়ি ফিরে।

৫.বিদেশী শব্দঃ যেসব শব্দ সংস্কৃত ছাড়া বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলা হয়।

এদেশের সাথে বিদেশী ভাষাভাষীদের বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচুর বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভাবনের সাথে যুক্ত হয়ে এর শ্রীবৃক্ষি ঘটিয়াছে। মুসলমান শাসকেরা বহুদিন যাবত এদেশে শাসন করেছেন। তাঁরা ছিলেন বহিরাগত। তাঁদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, রাজভাষা ছিল ফারসি এবং ঘরোয়া ভাষা ছিল তুর্কি। তাঁদের প্রভাবে এ তিনি জাতের বহু শব্দ বাংলা ভাষার শব্দের সাথে যোগ হয়েছে। ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রায় আড়াই হাজারের মত ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।

এর পরে এসেছে পর্তুগিজ ও ইংরেজি। বহুদিনব্যাপি তারা এদেশ শাসন করেছে। ফলে প্রচুর পর্তুগিজ ও ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। তাছাড়া ইংরেজি শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দও বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। নিচে বিদেশী শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

১. আরবি শব্দঃ অন্দর, অছিলা, অজুহাত, আতর, আজব, আথের, আদত, আক্ষেল, আকবর, আবির, আমল, আমলা, আদাব-কয়দা, আমিন, আমানত, আয়েশ, আরক, আরশ, আসবাব, আলবত, আলাদা, আসামী, আসল, আলখাল্লা, আলোয়ান, ইজারা, ইজ্জত, ইনাব, ইনকিলাব, ইশারা, ইশতিগ্রাহ, ইসলাম, ইহুদি, ইন্তিকাল, এলাকা, এজমালি, এজলাস, এক্সিয়ার, ওমরা, ওকালত, ওজন, ওয়াসিল, ওয়ারিশ, ওয়াস্তে, কসুর, কসাই, কলাই, কলপ, কাফন, কাফের, কামাল, কামিজ, কায়দা, কালিয়া, কায়েম, কাহিল, কিস্তি, কুলুপ, কুদ্রত, কুমকুম, কেতাব, কেত, কেরামতি, কেল্লাফতে, ক্রোক, থতম, থবর, থয়রাত, থতিয়ান, থাদিম, থাতির, থসড়া, থাজনা, থারাপ, থারিজ, থালি, থাসা, থেতাব, থেয়াল, থেসারত, থেলাপ, থোলা, গজল, গলদ, গড়গড়া, গোসা, গায়ের, গর, গরিব, গলদ, ছবি, ছাদ, জনাব, জহর, জবাব, জমা, জমান, জামায়েত, জলদি, জলসা, জরিপ, জরিমানা, জল্লাদ, জাহাজ, জালিয়াত, জাহির, জিনিস, জিজিরা, জেরা, জেরাফ, জুলুম, জ্বালাতন, জোলুস, তওবা, তকদির, তদবির, তকলিফ, তচ্ছুফ, তহবিল, তলব, তফসিল, তবিয়ত, তফাহ, তমশুক, তামাদি, তরফ, তর্জমা, তথত, তাগিদ, তাজিয়া, তালাক, তাজ্জব, তানপুরা, তারিফ, তামাম, তালু, তালিকা, তামিল, তুফান, তুলকামাল, তৈয়ার, তোড়া, তোয়াক্ষা, দখল, দজ্জাল, দফা, দলিল, দফারফা, দাখিল। দাওয়াই, দায়রা, দালাল, দেনা, দোয়া, দুনিয়া, দোয়াল, দৌলত, নকসা, নকল, নবাব, নজির, নহবত, নাকাত, নাগাল, নেহাত, নিশা, নূর, নিকাশ, নিবা, নায়ের, নাজির, ফকির, ফক্র, ফতে, ফতুর, ফতোয়া, ফরাস, ফসল, ফসকা, ফর্দ, ফায়দা, ফানুস, ফালার, ফাঁক, ফি, ফুরসত, ফেরার, ফোয়ার, ফৌজ, বহি, বই, বকেয়া, বন্দুক, বদর, বয়ান, বহর, বদল, বাতিল, বিলকুল, বাদে, বাবদ, বেসাতি, বিলাত, মকতব, বোরাক, মজবুত, মক্ষেল, মজুদ, মজুর, মজিল, মদদ, মনি, মফস্বল, মলম, মর্জি, ময়দান, মশাল, মাশলা, মশগুল, মসজিদ, মসনদ, মহড়া, মহকুম, মঙ্গলা, মহল্লা, মহকুত, মহাফেজ, মাতৰুর, মাদ্রাসা, মাফ, মাফিক, মামলা, মারফত, মামুলি, মাল, মালিক, মাল্লা, মাসহারা, মিনার, মিছরি, মিসর, মুনশী, মুনফা, মুনফে, মুরব্বী, মূলতবী, মূলুক, মুসলিম, মুসাফির, মুসাবিদা, মুশকিল, মুহুরি, মেজাজ, মেরামত, মোকদ্দমা, মেহনত, মোসাহেব, মোক্ষম, মৌলবী, মোতায়েন, মোকাবিলা, মোজার, মোলায়েম, মোল্লা, মৌসুমি, রদ, রঞ্জ, রফা, রাশি, রায়ত, রিপু, রঞ্জু, রেওয়াজ, রোয়াক, লহমা, লাখেরাজ, লায়েক, লেপ, লেফাফা, লেবু, লোকসান, শরবত, শথ, শয়তান, শরাব, শারিক, শহীদ, শুরু, শর্ত, সই, সড়কি, সদর, সন, সফর, সনদ, সবুর, সহিস, সাকিন, সাফ, সাবেক, সামাল, সিকি, সিন্দুক, সুলতান, হক, হজম, হদ, হরফ, হরকত, হাওলাত, হাজত, হাকিম, হামলা, হারাম, হাল, হালত, হাসিল, হালুয়া, হিকমত-হিক্মত, হিসাব-নিকাশ, হকুম, হজ্জত, হলিয়া, হেফাজত ইত্যাদি।

নিচে আমার দুটি কবিতা শেয়ার করলাম আরবি শব্দ মনে রাখার জন্যঃ

ধর্মসংক্রান্ত কিছু শব্দ মনে রাখার কোশলঃ

ওয়ুগোসল করে পড়ি হাদিস কোরআন
মেনে চলি আরো যত হালাল হারাম
হস্ত, যাকাত, তসবি আর কোরবানি করি
আল্লাহর কাছে আরো তওবা পড়ি
ঈমান রাখি কেয়ামত, জান্নাত, জাহান্নামে
তাতেই পূর্ণতা ইসলামে.. ।

কিছু প্রশাসনিক শব্দ মনে রাখার কৌশল:

‘আজ নগদ, কাল বাকি’
তবুও মহকুমা মোকাবের অনুরোধ রাখি
মুন্মেফকে দোয়াত-কলম-কিতাব দিলেন বাকি
গায়ের হইল মুন্মেফ মোকাব পড়িলেন বিপাকে
আলেম, এলেম নিয়ে গেলেন খুজিতে তাকে
হল না কিছুই ওজর এজলাস কানুন কেচ্ছাতে
উকিল ধরে শেষে রায় পেলেন আদালতে..।

২. ফারসি ও ফরাসি শব্দ: মূলত আরবি, তুর্কি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ হিসেবে পরিচিত।

যেমন:

ফারসি ও আরবি মিশ্রণঃ আজগুবি, আবহাওয়া, খামখেয়াল, কুচকাওয়াজ, খুনখানাপ, খোশমেজাজ, খোদাতালা, জবরদখল, গরম মশ্বা, দস্তখত, দহরম-মহরম, নাবালক, নাদাবি, নাহক, নারাজ, নেক, নজর, নিমকহারাম, বেয়াকুব, বে-কসুর, বাজিমাত, বেহদ, বেফাঁস ইত্যাদি।

ফারসি ভাষা থেকে আগত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ:

আল্দাজ, আওয়াজ, আফসোস, আবহাওয়া, অজুহাত, আবাদ, আদমি, আমদানি, আমেজ, আয়না, আরাম, আসমান, আস্তানা, আশকারা, ইয়ার, ওস্তাদ, কামাই, কারখানা, কারবার, কারিগর, কিনারা, কিশমিশ, কুষ্টি, কোমর, খাতা, খরচ, খঙ্গর, খরগোশ, খুব, খোদা, কম, বেশি, জোড়, তোপ, চশমা, জবানবন্দি, মোকদ্দমা, মালিক, সিপাহী, গুনাহ, গোলাপ, রোজ, গোয়েন্দা, চাকরি, চাঁদা, চাকর, চালাক, চেহারা, জবাব, দরজা, তীর (বাণ), তৈয়ার, তারিখ, দরবার, দোকান, দরিয়া, দারোয়ান, বস্তা, বাজি, বাল্দা, বাদশাহ, বেগম, দস্তখত, দোলত, দোয়খ, নামাজ, নালিশ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা, মজুর, ময়দা, মোরগ, মাহিনা, মিহি, মেথর, রপ্তানি, রাস্তা, রসদ, রুমাল, রেশম, লাশ, শহর, শায়েস্তা, শিরনামা, সওদা, সবজি, সবুজ, সরকার, সর্দি, সাজা, সাদা, সানাই, সে (তিন), হস্তা, হজার, হিন্দু, হাঙ্গামা, কার্তুজ, কাফে, কুপন, রেষ্টোরা, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ইত্যাদি।

কিছু ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল:

চশমার দোকানদার ও কারখানার মেথর বোজার দিনে নামায না পড়ায় বেগম বাদশার কাছে নালিশ করলেন। তাই শুনে বাদশা তাদেরকে দরবারে ডেকে দস্তখত নিয়ে জানোয়ার ও বদমাশ বলে দোজখে পাঠালেন।

ফরাসী(ফ্রান্স) শব্দ মনে রাখার কৌশল:

গেরেজে কার্তুজের ডিপোতে বুর্জোয়া ইংরেজ ওলন্দাজদের রেষ্টোরার কুপন আছে।

আরবি-তুর্কি মিশ্রণঃ খাজাঞ্চি।

৩. তুর্কি শব্দ: ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলায় তুর্কি শব্দ চালিশটির বেশী হবে না। আলখাল্লা, কুলি, কোর্মা, থাতুম, বেগম, লাশ, বাবা, বাবু, চাকু, বোচকা, দারোগা, ফিরিঙ্গি, ফালতো ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ শব্দ মনে রাখার কৌশল:

বিবি বেগম কোর্মা থায়
বাবা বাহাদুর দেশ চালায়।
দারোগা বাবু তাকিয়ে দেখে
গালিচায় কুলির লাশ।
চাকু হাতে বাবুটি তাই দেখে হতবাক।

অথবা, উজবুক দারোগা চাকর, কুলি ও বাবুটিদের চকমক চাকু কাঁচি দিয়ে লাশ কাটতে আদেশ দিলেন।

৪. ইংরেজী শব্দ: অফিস, আর্ট, আস্ত্রাবল, এনামেল, এজেন্ট, ইঞ্জিন, কংগ্রেস, কনস্টেবল, কফি, কমা, ক্যাপ্টন, কার্নিশ, কলেজ, কেক, কেটলি, কেয়ার, কোরেসিন, কেস, কোর্ট, কোট, কোম্পানি, ক্যামাবিস, কামেরা, ক্রীশ্চান, ক্লাব, ক্লার্ক, গার্জেন, গেজেন্ট, গেঙ্গি, গেট, গেলাস, চেক, চেয়ার, চেন, জেটি, জেল, জ্যাকেট, টাইপ, টিকিট, টিফিন, টিন, টেবিল, টেলিগ্রাম, ট্যাক্সি, ট্রাম, ট্রেন, ডক, ডজন, ডাক্তার, ডিপো, ড্রাম, ড্রেন, থিয়েটার, নম্বর, নিব, পকেট, প্যাকেট, পাউডার, পাস, পার্শ্বেল, পালিশ, পিয়ন, পুলিশ, পেট্রোল, পেন, পেনসিল, পেনসন, ফোন, ফটো, ক্রক, বাক্স, ফ্যাশন, ফ্লাট, বোনাস, মাস্টার, মাইল, মিটার, মেস, ম্যানেজার, সার্কাস, সার্জন, সিগ্যান্স, সেমিকোলন, সিলেমা, সেমিজ, হল, শার্ট, স্টেশন, হাইকোর্ট ইত্যাদি।

৫. পর্তুগিজ শব্দ: ত্রুশ, পাদ্রি, গির্জা, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙ্গা, কপি, বাতাবি, তামাক, আতা, চাবি, তোয়ালে, বোতল, বালতি, গামলা, গুদাম, বারাল্দা, ফিতা, পেরেক, কামরা, টুপি, আলকাতরা, কামিজ, বোতাম, মিস্তি, আচার, বাসন, পাচার, আয়া, আলপিন, কেদারা, কোরানি, গরাদ, জানালা, পারদ, পাউরটি, পিস্তল, বেহালা, বোমা, মার্কা, মাস্তুল, সাবান, গুদাম, সাগু ইত্যাদি।

পর্তুগীজ শব্দ মনে রাখার কৌশল:

গীর্জার পাদ্রী চাবি দিয়ে গুদামের আলমারি খুলে তাতে আনারস পেঁপে পেয়ারা আলপিন ও আলকাতরা রাখলেন। কেরানি দিয়ে কামরা পরিষ্কার করে জানালা খুলে দিলেন। তারপর পেরেক ইঞ্জি ইস্পাত ও পিস্তল বের করে বালতিতে রেখে বোমা বানালেন।

অথবা, [এইটা কিন্তু আমি লিখি নাই .. হাহা] বিন্তি সাবান, বালতি ও তোয়ালে নিয়ে কামরায় টুকিল। সে ঝর্ণা ছাড়িয়া তার কামিজের বোতাম ও ফিতা খুলিতে লাগিল। এমন সময় আতা জানালায় টোকা মারিল। কেরানী বারাল্দার কেদারায় বসিয়া ইহা দেখিয়া ফেলিল। আয়া পেঁপে, পেয়ারা, পাউরটি, আচার, সাগু ও সালসা নিয়ে বারাল্দায় আসিল। তারা ফালতো মঞ্চরা করে একটি গান গাইল-স্বামী আর ইষ্টিরি পেরেক মারে মিস্তি।

৬. ওলন্দাজ শব্দ: ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, টেক্ষা, তুরুপ, চিরাতন, ইস্কুল ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখার কৌশল: ওলন্দাজরা ইস্কাপন, টেক্ষা, তুরুপ, রুইতন, হরতন দিয়ে তাস খেলে।

৭. হিন্দি শব্দ: জঙ্গল, কুওঁ, আঞ্চা, সঙ্গ, ঠান্ডা, ভরসা, বাঞ্চা, চানাচুর, চেহারা, থিল, ঝুট, চিজ, পানি, কমলা, খানাপিনা, চৱকা, চাহিদা, কাহিনী, চামেলি, তাহড়া, আন্দাজ, সাথী ইত্যাদি।

৮. টীকা শব্দঃ চা, চিনি, লিচু, এলাচি, সিঁদুর, টাইফুন, হোয়াংহো, সাটিন, গুলাচি (ফুল) ইত্যাদি।

৯. জাপানি শব্দঃ রিকশা, সাম্পান, প্যাগোডা, হারিকিরি, হাস্পাহেনা, নিষ্পন ইত্যাদি।

[টেকনিক: হাস্পাহেনা হারিকিরি রিওয়ায় চড়ে ক্যারাটে, প্যাগোড়া ও সুনামী ;) দেখতে গেল।

১০. ইতালি শব্দঃ গেজেট, ম্যালেরিয়া, ম্যাজেন্টা, রোম ইত্যাদি।

১১. ইন্দোনেশীয় শব্দঃ বর্তমান, বাতাবি ইত্যাদি।

১২. বর্মী শব্দঃ ফুল, ফুঙ্গি, লুঙ্গি, লামা, নাঞ্চি, আরাকান ইত্যাদি।

১৩. মার্বাঠি শব্দঃ যৌথ, বর্গী ইত্যাদি।

১৪. রুশ শব্দঃ সোভিয়েত, বলশেভিক, কমিউন, স্কৃণিক ইত্যাদি।

১৫. গুজরাটি শব্দঃ হরতাল, জয়ন্তী, খন্দর ইত্যাদি।

১৬. মালয়: কাকাতুয়া, গুদা, কিরিচ, সাও।

১৭. জার্মানি : ফ্যুরার

১৮. পেরু : কু ইনাইন

১৯. অস্ট্রেলিয়া : ক্যাঙ্গাৰু

২০. ইতালি: ম্যাজেন্টা;

২১. রুশ : বলশেভিক;

২২. সিংহল : বেরিবেরি।

২৩. গ্রিক : কেন্দ্র, দাম, সুরপ্স।

২৪. সাঁওতালি : বোঙা, হাঁড়িয়া।

২৫. তামিল : চেড়ি।

২৬. পাঞ্চাবি: তরকা।

২৭. তিব্বতি: লামা;

২৮. মার্বাঠি : বরগি।

২৯. দক্ষিণ আফ্রিকা: জেৱা;

■ অর্থনুসারে শব্দের শ্রেণীবিভাগ:

অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দ সমূহকে তিনভাগে ভগা করা হয়েছে। যেমন:

১. যৌগিক শব্দ, ২. রূট বা রূটি শব্দ ও ৩. যোগরূট শব্দ

১. **যৌগিক শব্দঃ** যেসব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে গঠিত হয় এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে যেসব শব্দের ব্যবহারিক অর্থের সাথে অভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

যেমন: কৃ + তব্য = **কর্তব্য** (যা করা উচিত); [ব্যবহারিক অর্থও একই।]

গৈ + অক = **গায়ক** (গান করে যে)।

টেকনিক: **মধুর গায়ক কর্তব্য** না করে **বাবুয়ানা** ভাব করে দোহিত্রিকে নিয়ে চিকামারতে গেল।

২. **রূট বা রূটি শব্দঃ** যেসব প্রত্যয় নিষ্পল শব্দ উহার প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ না করে জন সমাজে প্রচলিত পৃথক অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, সেসব শব্দকে রূট শব্দ বা রূটি শব্দ বলে। যেমন হস্তী (হস্ত + ইন) অর্থাৎ হস্ত বা হাত আছে যার। কিন্তু প্রচলিত অর্থে হস্তী বলতে বিশেষ পশু শ্রেণীকে নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে:

রূট	ব্যুপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
দুহিতা	যে দোহন করে	কন্যা

ରାଥାଳ	ଯେ ରଙ୍ଗ କରେ	ଯେ ଗବାଦିପଣ୍ଡ ଚରାୟ
ଅତିଥି	ଯାର ସ୍ଥିତି ନେଇ	ମେହମାନ
ହରିଣ	ଯେ ହରଣ କରେ	ପଣ୍ଡବିଶେଷ
ପାଞ୍ଜାବୀ	ପାଞ୍ଜାବ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ	ଜାମା ବିଶେଷ
ଗବାକ୍ଷ	ଗନ୍ଧର ଚୋଥ	ଜାନାଲା
କୃଶଳ	ଯେ କୁଶ ଆହରଣ କରେ	ନିପଣ
ବାଁଶି	ବାଁଶେର ତୈରି	ବାଦ୍ୟନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର	ଯାର ନିଜେର ତତ୍ତ୍ଵ ଆଛେ	ଦଲଭୁକ୍ତ ନୟ
ଅର୍ଧାନ୍ତିନୀ	ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗେର ଅଧିକାରୀ	ଶ୍ରୀ
ଶ୍ରୁଦ୍ଧଷା	ଶୋନାର ଇଚ୍ଛା	ରୋଗୀର ସେବା କରା
ପ୍ରୀଣ	ପ୍ରକୃଷ୍ଟଳପେ ବୀଳ ବାଜାତେ ପାରେନ ଯିନି	ବୟଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି
ଗୋ	ଯେ ଗମନ କରେ	ଗନ୍ଧ
ମନ୍ଦେଶ	ସଂବାଦ	ମିଷ୍ଟାନ୍ତ

ଟେକନିକ: ତେଲେ ଭାଜା ମନ୍ଦେଶ ଥେଯେ ପ୍ରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଧାନ୍ତିନୀ ନିଯେ ଗବେଷଣା ମମ୍ପନ୍ତ କରେ ହଣ୍ଡିର ପିଠେ ଚଢ଼େ ରାଥାଲେର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାଁଶି ଶୁନତେ ଗେଲା।

3. ଯୋଗନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ: ସମାସ ନିଷ୍ପଳ ଯେମବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସମାସ୍ୟମାନ ପଦସମ୍ମହେର ଅର୍ଥେର ଅନୁଗାମୀ ନା ହୟ କୋନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥପ୍ରକାଶ କରେ, ତାଦେରକେ ଯୋଗନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବଲେ।

ଯେମନ-ପକ୍ଷେ ଜନ୍ମେ ଯା = ପକ୍ଷଜ। ପକ୍ଷେ ବା ପୁକୁରେ ଅନେକ କିଛୁ ଜନ୍ମାଲେଓ ପକ୍ଷଜ ବଲତେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ପଦ୍ମଫୁଲକେ ବୁଝାଯା ଅନୁକପଭାବେ:

ଯୋଗନ୍ତ୍ର	ବ୍ୟପତିଗତ ଅର୍ଥ	ବ୍ୟବହାରିକ ଅର୍ଥ
ମାରୋଜ	ମରୋବରେ ଜନ୍ମେ ଯେ	ପଦ୍ମ
ଜଲଦ	ଜଳ ଦେଇ ଯା	ମେଘ
ଅନ୍ନ	ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ	ଭାତ
ଅସୁଥ	ସୁଥର ଅଭାବ	ଅସୁସ୍ଥତା
ବଲଦ	ଯେ ବଲ ଦାନ କରେ	ଗୁର୍କ
ବୈବାହିକ	ବିବାହେର ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ୍ୟକୁ	ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାର ଶ୍ଵଶର
ମୁହୂଦ	ମୁଖେର ହଦୟ ଯାର	ବଞ୍ଚୁ
ମହାୟାତ୍ରା	ମହାସମାରୋହେ ଯାତ୍ରା	ମୃତ୍ୟୁ
ଜଲଧି	ଜଳ ଧାରଣ କରେ ଯେ	ସମ୍ମୁଦ୍ର

ଟେକନିକ: ପକ୍ଷଜ ରାଜପୁତ ବଲଦ ନିଯେ ମହାୟାତ୍ରା କରେ ତାର ଅସୁମ୍ଭୀ ମୁହୂଦ ଜଲଧିର ପରିବାରେର ସାଥେ ଦେଖା କରେ।

■ ଗର୍ଥନ ଅନୁମାରେ ଶବ୍ଦେର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ:

ଶବ୍ଦ ଗର୍ଥନେର ଦିକ୍ ଥିକେ ବିଚାର କରଲେ ବାଂଲା ଭାଷାର ସକଳ ଶବ୍ଦକେଇ ପ୍ରଧାନତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀତେ ବିଭକ୍ତ କରା ଯାଯା।
ଯେମନ: 1. ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଓ 2. ସାଧିତ ଶବ୍ଦ ବା ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ।

১. মৌলিক শব্দ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। তাই মৌলিক শব্দ হচ্ছে ভাষার অবিভাজ্য স্পষ্ট অর্থযুক্ত শব্দ। যেমন- মা, বাবা, বই, খাতা, বল, কলম, ভাই, বোন, হাত, পা, মুখ, কান ইত্যাদি। এসব শব্দকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলেও কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব শব্দ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে বলে এদেরকে স্বয়ংসিদ্ধ শব্দও বলা হয়।

মৌলিক শব্দগুলোকে ভাঙা যায় না বলে এগুলোকে প্রকৃতিও বলা হয়। প্রকৃতি দুই প্রকার। যেমন: ক, নাম প্রকৃতি ও খ. ক্রিয়া প্রকৃতি।

ক. নাম প্রকৃতি: যেসব শব্দ দ্বারা বস্তু, জাতি, প্রাণী, জাতি, স্থান, ওণ বা দোষের নাম বুঝায়, তাকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন: বই, পাথর, লাল, কাল, ঢাকা ইত্যাদি।

খ. ক্রিয়া প্রকৃতি: ক্রিয়ার মূলকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু। যেমন: ক, র্ধ, ম ইত্যাদি।

২. সাধিত শব্দ বা যৌগিক শব্দ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যে সব শব্দকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় এবং শব্দের ভগ্ন অংশ থেকেও তার পুরোপুরি অর্থ বোধগম্য হয়, সেই বিভাজ্য শব্দকে সাধিত শব্দ বলা হয়। যেমন: মেঘ + লা = মেঘলা, হাত + পাথা = হাতপাথা, বাবু + গিরি = বাবুগিরি, দ্বি + ধা = দ্বিধা, হাত + ল = হাতল ইত্যাদি।

সাধিত শব্দকে গঠন প্রকৃতির দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. কৃদন্ত শব্দ, খ. তদ্বিতান্ত শব্দ ও গ. সমাসবদ্ধ শব্দ।

ক. **কৃদন্ত শব্দ:** ধাতুর সাথে কৃৎপ্রত্যয় যোগে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে কৃদন্ত শব্দ বলে। যেমন: $\sqrt{\text{লড়}} + \text{আই} = \text{লড়াই}$, $\sqrt{\text{ঘূম}} + \text{অন্ত} = \text{ঘূমন্ত}$, $\sqrt{\text{রাথ}} + \text{আল} = \text{রাথাল}$ ইত্যাদি।

খ. **তদ্বিতান্ত শব্দ:** মৌলিক শব্দের সাথে তদ্বিত প্রত্যয় যোগে যেশব্দ গঠিত হয়, তাকে তদ্বিতান্ত শব্দ বলে। যেমন: কলা + আলি = কলালি, ঢাকা + আই = ঢাকাই, ছাপা + আনা = ছাপানানা, দুষ্ট + আমি = দুষ্টামি ইত্যাদি।

গ. **সমাসবদ্ধ শব্দ:** সমাসের নিয়মে একাধিক শব্দ সহযোগে যেসব শব্দ গঠিত হয়, তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন: নদী মাতা যার = নদীমাত্রক, সিংহ চিহ্নিত যে আসন = সিংহাসন, চাঁদের ন্যায় মুখ = চাঁদমুখ ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও নানা পদ্ধতিতে শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন:

১. **উপসর্গযোগে:** উপসর্গের নিজস্ব বা আলাদা কোন অর্থ নেই। মূল শব্দের পূর্বে উপসর্গ প্র, পরা, পরি, সু ইত্যাদি বসে নতুন শব্দ গঠন করে। শব্দ আদিতে প্রযোগে: প্রধান, প্রচার, প্রগতি, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি। অযোগে: অদেখা, অচেনা, অবেলা ইত্যাদি।

২. **বিভক্তিযোগে:** ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। এখানে ডাঙ্গা + য = ডাঙ্গায় এবং জল + এ = জলে, যথাক্রমে ‘য়’ ও ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

৩. **সম্বন্ধির সাহায্যে:** পরি + সৈক্ষণ্য = পরীক্ষণ, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, সম + লাপ = সংলাপ, অতি + আচার = অত্যাচার, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, নে + অন = নয়ন, গৈ + অক = গায়ক ইত্যাদি।

৪. **পদের দ্বিরুক্তিতে:** গ্রামে: গ্রামে, ভালোয়: ভালোয়, ভাইয়ে: ভাইয়ে ইত্যাদি।

৫. **পদ পরিবর্তনের সাহায্যে:** লোক:লৌকিক, মুখ:মৌখিক, জাতি:জাতীয়, ভদ্র:ভদ্রতা, বিবাহ:বিবাহিত, মেধা:মেধাবী ইত্যাদি।

৬. **সমাস নিষ্পন্ন দ্বারা:** পক্ষে জন্মে যা ০ঃ পঞ্জ, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গয়ে হলুদ, চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা ইত্যাদি।

৭. **সংখ্যাবাচক শব্দযোগে:** এগার, এগারই, একাদশ, একত্রিশ, একত্রিংশ, একত্রিশে ইত্যাদি।

■ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মিশ্র শব্দ

বাংলা ভাষায় নানা জাতের শব্দের সমাবেশে এর ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তৎসম, তৎব, দেশী ও বিদেশী শব্দের মধ্যে পারস্পারিক মিল সাজশে তথা শব্দ বা প্রত্যয়যোগে যেসব নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে সেগুলোকে মিশ্র বা শংকর শব্দ বলা হয়। যেমন:

বিদেশী-দেশী শব্দযোগে: রাজাউজীর, হাটবাজার, ধনদৌলত, মাস্টারমশাই, পাইরন্টি, ডাক্তারবাবু, ফুলহাতা, হেডপ-টিং ইত্যাদি।

বিদেশী-বিদেশী: হেডমোলবী, পুলিশসাহেব ইত্যাদি।

প্রত্যয়যোগে মিশ্র শব্দ: ডেপুটিগিরি, প-তিতি, মাস্টারি, গৃহিণীপনা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মোট সোয়া লক্ষের মত শব্দ রয়েছে। এর মধ্যে তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার, আরবি-ফারসি আড়াই হাজার, তুর্কি ও ইংরেজি শব্দ প্রায় আটশ এবং শব্দেড়েক শব্দ রয়েছে পর্তুগীজ ও ফারসি। এছাড়া বিদেশী কিছু সংখ্যক শব্দও রয়েছে। অন্যান্য শব্দ তৎব ও দেশী।

দ্বিরুক্ত শব্দ:

দ্বিরুক্ত শব্দ: দ্বিরুক্ত শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় ‘দ্বি+উক্ত’। অর্থাৎ, যা দুইবার বলা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ বা পদ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে অন্য একটি বিশেষ অর্থপ্রকাশ করে। কোন শব্দ বা পদ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন- ‘আমার জ্বর জ্বর লাগছে।’ এখানে ‘জ্বর জ্বর’ দ্বিরুক্ত শব্দটি ঠিক ‘জ্বর’ অর্থ প্রকাশ করছে না। জ্বরের ভাব প্রকাশ করছে।

দ্বিরুক্ত শব্দ ৩ প্রকার- শব্দের দ্বিরুক্তি, পদের দ্বিরুক্তি ও অনুকার দ্বিরুক্তি।

(ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

১. একই শব্দ অবিকৃতভাবে দুইবার ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- ভাল ভাল বই, কেঁটা ফোঁটা জল, বড় বড় বাড়ি, ইত্যাদি।

২. সহচর শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। দুটি সম্পর্কিত শব্দকে সহচর শব্দ বলা যায়। যেমন, ‘কাপড়-চোপড়’ সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ। ‘কাপড়’ অর্থ গা ঢাকার জন্য যেসব পরা হয়। আর কাপড়ের সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে যেগুলো পরা হয় সেগুলোই ‘চোপড়’। অর্থাৎ, এই দুটি শব্দ পরস্পর সম্পর্কিত।

তাই এই দুটি শব্দ সহচর শব্দ। এরকম- লালন-পালন, থেঁজ-থবর, ইত্যাদি।

৩. একই শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে পরেরবার একটু পরিবর্তিত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ হতে পারে। যেমন- মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্ল-সল্ল, রকম-সকম, ইত্যাদি।

৪. সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ হতে পারে। যেমন- ধন-দৌলত, বলা-কওয়া, টাকা-পয়সা, ইত্যাদি।

৫. বিপরীতার্থক শব্দযোগেও দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া, ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি/ পদাত্মক দ্বিরুক্তি

পদ বা বিভক্তিযুক্ত শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে পদের দ্বিরুক্তি বা পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হতে পারে-

১. একই পদ অবিকৃতভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে। যেমন- ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। মনে মনে আমিও এ কথাই ভাবছিলাম।

২. দ্বিতীয় পদ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে। তবে এক্ষেত্রেও পদ-বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, মূল শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- আমরা হাতে-নাতে চোরটাকে ধরেছি।

৩. সহচর, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে পরপর ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- আমার সমস্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। দেশে বিদেশে বইটি লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী, আর পথে-প্রবাসে লিখেছেন মুহাম্মদ এনামুল হক।

#পদাত্মক দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

#বিশেষ পদের দ্বিরুক্তি:

(উল্লেখ্য, বিশেষ পদের দ্বিরুক্তি হলে সেগুলো বিশেষণ পদের মত কাজ/ আচরণ করে। অর্থাৎ, বিশেষ পদের দ্বিরুক্তি হলে সেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)

১. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান

২. সামান্য বোঝাতে : আমার জ্বর জ্বর লাগছে। কবি কবি ভাব।

৩. পরম্পরাতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। ওরা বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলছে।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।

৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।

৬. আগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে ডাকছে।

#বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি

১. আধিক্য বোঝাতে : ভাল ভাল আম। ছেট ছেট ডাল।

২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপী। নরম নরম হাত।

৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব। কাল কাল চেহারা।

সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি

১. বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : সে সে লোক কোথায় গেল? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

ক্রিয়াপদের/ ক্রিয়াবাচক পদের দ্বিরুক্তি

১. বিশেষণ রূপে : রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।

২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এল।

৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যাও। ঘূমিয়ে ঘূমিয়ে শুলে কিভাবে?

৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি।

অব্যয় পদের দ্বিক্রিতি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি এত খারাপ!

২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।

৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফেঁড়াটা টন টন করছে।

৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।

৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিক্রিতি শব্দের প্রয়োগ

সতর্কতা বোঝাতে : ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো।

ভাবের প্রগাঢ়তা বোঝাতে : ভুলগুলো তুই আনরে বাচা বাচা।

কালের বিসঞ্চার বোঝাতে : থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।

আধিক্য বোঝাতে : লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।

থাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

পদ

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে।

বাক্যে যখন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়। এগুলোকে বলে বিভক্তি। যে সব শব্দে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি, সে সব শব্দেও একটি বিভক্তি যুক্ত হয়। একে প্রথমা বিভক্তি বা শূণ্য বিভক্তি বলে। ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তাতে বিভক্তি যুক্ত হতে হয়। আর তাই কোন শব্দ বাক্যে বিভক্তি না নিয়ে ব্যবহৃত হলেও তার সঙ্গে একটি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তাকে শূণ্য বিভক্তি বলা হয়।

অর্থাৎ, বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে।

পদের প্রকারভেদ : পদ প্রধানত ২ প্রকার- সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ আবার ৪ প্রকার- বিশেষ, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।

অর্থাৎ, **পদ মোট ৫ প্রকার-**

১. বিশেষ্য
২. বিশেষণ
৩. সর্বনাম
৪. ক্রিয়া
৫. অব্যয়

[শব্দের শ্রেণীবিভাগ হলো- তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ব, দেশি ও বিদেশি। অন্যদিকে পদের শ্রেণীবিভাগ হলো- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। দুইটিই ৫ প্রকার।]

যখন পর্যন্ত কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তখনে সেটি কোন পদ নয়। কোন শব্দ কোন পদ হবে তা নির্ভর করে বাক্যে কিভাবে ব্যবহৃত হলো তার উপর। তাই কোন শব্দকে আগেই বিশেষ্য বা বিশেষণ বলে দেয়া ঠিক নয়। যেমন-

তোমার হাতে কি?

ডাকাত আমার সব হাতিয়ে নিয়েছে।

জঙ্গীরা হাত বোমা মেরে পালিয়ে গেলো।

প্রথম বাক্যে হাত শব্দটি বিশেষ্য। আবার দ্বিতীয় বাক্যে এই হাত শব্দটিই একটু পরিবর্তিত হয়ে ক্রিয়া হয়ে গেছে। আবার তৃতীয় বাক্যেই আবার হাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে।

[তবে প্রশ্নে শুধু শব্দ দিয়ে সেটি কোন পদ জিজ্ঞেস করলে সাধারণত শব্দটি যে পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটি দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি শব্দই সাধারণত একেক পদ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় একেক রূপ নেয়। যেমন, ‘হাত’ শব্দটি বিশেষণ হিসেবে কোন বিভক্তি নেয়নি, কিন্তু বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিভক্তি নিয়েছে। আবার ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় প্রত্যয় নিয়েছে। এভাবে প্রশ্নের শব্দটিকে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে কোন পদ নির্ণয় করা যেতে পারে।]

বিশেষ্য পদ

কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে।

যে পদ কোন ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার-

১. নামবাচক বা সংজ্ঞবাচক বিশেষ্য

(ক) ব্যাক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল

(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিলিল, লন্ডন, মক্কা

(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর

(ঘ) গ্রহের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশবিদেশে, বিশ্বনবী

২. জাতিবাচক বিশেষ্য : (এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, পাথি, পর্বত, নদী, ইংরেজ

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য : বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবন, পানি

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) : সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল

৫. ভাববাচক বিশেষ্য (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়) : গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন, দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া

৬. গুণবাচক বিশেষ্য : মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ

বিশেষণ পদ

যে পদ বাক্যের অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

অর্থাৎ, বিশেষণ পদ অন্য কোন পদ সম্পর্কে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করে, বা অন্য পদকে বিশেষায়িত করে।

[কিছু বিশেষণ পদ : (‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতা থেকে)

সফেদ দেয়াল

শান্ত ফটোগ্রাফ

জিঞ্জাসু অতিথি

ছোট ছেলে

নিষ্পুর্ণ কর্তৃপক্ষ

তিনটি বছর (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)

ରୁକ୍ଷ ଚର

ପ୍ରଶାକୁଳ ଚୋଥ

କ୍ଷୀୟମାଣ ଶୋକ

ମହଜେ ହୟେ ଗେଲ ବଲା (କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ)]

[ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ; ଭାଷା ଅନୁଶୀଳନ; ଏକଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍]

ବିଶେଷଣ ପଦ ୨ ପ୍ରକାର- ନାମ ବିଶେଷଣ ଓ ଭାବ ବିଶେଷଣ।

ନାମ ବିଶେଷଣ : ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ କୋନ ବିଶେଷ ବା ସର୍ବନାମ ପଦକେ ବିଶେଷାୟିତ କରେ, ଅର୍ଥାଂ ଅନ୍ୟ କୋନ ପଦ ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ବଲେ, ତାକେ ନାମ ବିଶେଷଣ ବଲେ । ଯେମନ-

- ବିଶେଷ୍ୟେର ବିଶେଷଣ : ଜୀଲ ଆକାଶ ଆର ସବୁଜ ମାଠେର ମାଝ ଦିଯେ ଏକଟି ଛୋଟ ପାଥି ଉଡ଼େ ଯାଛେ।
- ସର୍ବନାମେର ବିଶେଷଣ : ମେ କ୍ଲପବାନ ଓ ଗ୍ରଣବାନ।

ଭାବ ବିଶେଷଣ : ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ ପଦକେ ବିଶେଷାୟିତ କରେ, ଅର୍ଥାଂ ଅନ୍ୟ କୋନ ପଦ ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ବଲେ, ତାକେ ଭାବ ବିଶେଷଣ ବଲେ । ଭାବ ବିଶେଷଣ ୪ ପ୍ରକାର-

- କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ : ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଯୁ ବଯା । ପ୍ରାଣ ଏକ ବାର ଏମୋ ।
- ବିଶେଷଣେର ବିଶେଷଣ (କୋନ ବିଶେଷଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକଟି ବିଶେଷଣକେ ଓ ବିଶେଷାୟିତ କରେ, ତାକେ ବିଶେଷଣେର ବିଶେଷଣ ବଲେ) :
- ନାମ ବିଶେଷଣେର ବିଶେଷଣ : ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ଦୁଧ ଦାଓ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ମେ ଅତିଶ୍ୟ ଦୂଃଖିତ ।
- କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେର ବିଶେଷଣ : ରକେଟି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଚଲେ ।
- ଅବ୍ୟଯେର ବିଶେଷଣ (ଅବ୍ୟଯ ପଦ ବା ଅବ୍ୟଯ ପଦେର ଅର୍ଥକେ ବିଶେଷାୟିତ କରେ) : ଧିକ ତାରେ, ଶ୍ରତ ଧିକ ନିର୍ଲଙ୍ଘ ଯେ ଜନ ।
- ବାକ୍ୟେର ବିଶେଷଣ (କୋନ ପଦକେ ବିଶେଷାୟିତ ନା କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟିକେ ବିଶେଷାୟିତ କରେ) : ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଦେଶ ଆବାର ନାନା ସମସ୍ୟାଜାଲେ ଆବନ୍ଧ ହୟେ ପଡ଼େଛେ । ବାସ୍ତ୍ଵବିକଇ ଆଜ ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତିନ ପରିଶ୍ରମେର ପ୍ରୟୋଜନ ।

[ନା-ବାଚକ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ :

ନି-

- ଏଥିଲେ ଦେଖ ନି ତୁମି?
- ଫୁଲ କି ଫୋଟେ ନି ଶାଥେ?
- ପୁଞ୍ଚାରତି ଲଭେ ନି କି ଶାତୁର ରାଜନ? ରାଥି ନି ସନ୍ଧାନ
- ରହେ ନି, ମେ ଭୁଲେ ନି ତୋ

ନା-

- ବସନ୍ତେ ବରିଯା ତୁମି ଲବେ ନା କି ତବ ବନ୍ଦନାୟ?
- ରଚିଯା ଲହ ନା ଆଜଓ ଗୀତି ।
- ଭୁଲିତେ ପାରି ନା କୋନ ମତେ ।

ନାଇ-

- ଶୁଣି ନାଇ, ରାଥି ନି ସନ୍ଧାନ
- ନାଇ ହଲ, ନା ହୋକ ଏବାରେ
- କରେ ନାଇ ଅର୍ଧ ବିନ୍ଦୁନ?]

ନିର୍ଧାରିକ ବିଶେଷଣ : ଦ୍ଵିରକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯଥିନ ଏକେର ବେଶ କୋଣେ କିଛୁକେ ବୋଧାନେ ହୟ ତାକେ ନିର୍ଧାରିକ ବିଶେଷଣ ବଲେ । ଯେମନ-

ରାଶି ରାଶି ଭାରା ଭାରା ଧାନ

ଲାଲ ଲାଲ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାୟ ଗାଛ ଭରେ ଆଛେ ।

ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଘରେ ଘରେ ସାଡ଼ା ପଡ଼େ ଗେଛେ ।

ଏତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ଲିଖିଲେ ହବେ ନା ।

[বিশেষণবাচক ‘কী’

কী-শব্দটির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বিশেষণ হিসেবে এর ব্যবহার।

যেমন, ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতায় :

এই যে আসুন, তারপর **কী** খবর?

নিজেই চমকে, **কী** নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

কী সহজে হয়ে গেল বলা। (ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ)]

[বিশেষণ সম্বন্ধ

পাথরের টুকরো

আমাদের গ্রামের পুকুর

গ্রামের পুকুর

শোকের নদী

আমার সন্তান]

বিশেষণের অতিশায়ন (degree)

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে তুলনা বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বাংলা ভাষায় থাঁটি বাংলা শব্দের বা তদ্ব শব্দের একরকম অতিশায়ন প্রচলিত আছে, আবার তৎসম শব্দে সংস্কৃত ভাষার অতিশায়নের নিয়মও প্রচলিত আছে।

ক) বাংলা শব্দের বা তদ্ব শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মাঝে চাইতে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন-
গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।
বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

ব্যতিক্রম : কখনো কখনো প্রথম বিশেষ্যের শেষের ষষ্ঠী বিভক্তিই হতে, থেকে, চেয়ে-র কাজ করে। যেমন-
এ মাটি সোনার বাড়া। (সোনার চেয়েও বাড়া)

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সবথেকে, সবচেয়ে, সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

তোমাদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

৩. দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম অধিকতর, ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন-

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে বেশি সুন্দর।

ঘৃণের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।

কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।

থ) তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘তর’ যোগ হয়

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘তম’ যোগ হয়। যেমন-

গুরু- গুরুতর- গুরুতম

দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম

[তবে কোনো বিশেষণের শেষে ‘তর’ যোগ করলে সেটা যদি আবার শ্রাতিকটু হয়ে যায়, শুনতে থারাপ লাগে, তখন বিশেষণটির শেষে ‘তর’ যোগ না করে বিশেষণের আগে ‘অধিকতর’ শব্দটি যোগ করা হয়। যেমন-
‘অধিকতর সুশ্রী’।]

২. আবার, দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘ঈয়স’ প্রত্যয় যুক্ত হয় বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে ‘ইষ্ট’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-
 লঘু- লঘীয়ান- লঘীষ্ট
 অল্প- কনীয়ান- কনীষ্ট
 বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যোষ্ট
 শ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ

[দুয়ের তুলনায় এই নিয়মের ব্যবহার বাংলায় হয় না। অর্থাৎ, বাংলায় লঘীয়ান, কনীয়ান, জ্যায়ান, শ্রেয়ান, ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রচলন নেই। তবে ‘ঈয়স’ প্রত্যযুক্ত কতোগুলো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন-
 ভূয়সী প্রশংসা।]

সর্বনাম পদ

বিশেষ পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম পদ বলে।

অনুচ্ছেদে বা প্যারাগ্রাফে একই বিশেষ পদ বারবার আসতে পারে। সেক্ষেত্রে একই পদ বারবার ব্যবহার করলে তা শুনতে খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। এই পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য বিশেষ পদের পরিবর্তে অনুচ্ছেদে যে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে সেই বিশেষ পদকেই বোঝানো হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

[সর্বনাম পদগুলো সব বিশেষ বা নামের পরিবর্তে বসতে পারে বলে এদেরকে ‘সর্বনাম’ বলে।]

‘বাংলাদেশ’ অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ। এই দেশটি যেমন সুন্দর, এই দেশের মানুষগুলোও তেমনি ভালো। তারা এতোটাই ভদ্র ও মার্জিত যে, তাদের কাছে ভিখারি ভিক্ষা চাইতে আসলে তারা তাদের বিতাড়িত করে না। বরং মার্জিতভাবে বলে, মাফ করেন।’

উপরের অনুচ্ছেদে মূলত ৩টি বিশেষ সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘বাংলাদেশ’, ‘বাংলাদেশের মানুষ’ ও ‘ভিখারি’। এবং প্রথমবার উল্লেখের পর দ্বিতীয়বার কোন বিশেষ্যই আর উল্লেখ করা হয়নি। পরের বার থেকে ‘বাংলাদেশ’-র বদলে ‘এই দেশ’; ‘বাংলাদেশের (এই দেশের) মানুষ’-র বদলে ‘তারা’ ও ‘তাদের’ এবং ‘ভিখারি’-র বদলে ‘তাদের’ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ পদের বদলে ব্যবহৃত এই শব্দগুলোই হলো সর্বনাম পদ।

সর্বনাম পদগুলোকে মূলত ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
২. আন্তর্বাচক : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি
৩. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
৪. দূরস্ববাচক : ত্রি, প্রিসব, সব
৫. সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাৰৎ
৬. প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে
৭. অনিদিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু
৮. ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর
৯. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর

সাপেক্ষ সর্বনাম : কখনও কখনও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাকেয়ের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম। যেমন-

যত চাও তত লও (সোনার তরী)

যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যেই কথা সেই কাজ।

যেমন কর্ম তেমন ফল।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

[সাপেক্ষ সর্বনাম; ভাষা অনুশীলন; সোনার তরী]

সর্বনামের পুরুষ [PERSON]

[বিশেষ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুরুষভেদে ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিশেষণ ও অব্যয় পদের কোন পুরুষভেদ নেই।]

পুরুষ ও প্রকার। সুতরাং, সর্বনাম পদের পুরুষও তিটি-

উত্তম পুরুষ : বাক্যের বক্তা উত্তম পুরুষ। অর্থাৎ, যেই ব্যক্তি বাক্যটি বলেছে, সেই উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ : বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রেতাই মধ্যম পুরুষ। অর্থাৎ, উত্তম পুরুষ যাকে উদ্দেশ্য করে বাক্যটি বলে, এবং পাশাপাশি বাক্যেও উল্লেখ করে, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রেতাই মধ্যম পুরুষ।

মধ্যম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের, ইত্যাদি।

নামপুরুষ : বাক্যে বক্তা অনুপস্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্তি বা প্রাণীর উল্লেখ করেন, তাদের নামপুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন যা কিছুর কথা বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নামপুরুষ। নাম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।]

[সমস্ত বিশেষ পদই নামপুরুষ।]

অব্যয় পদ

অব্যয় শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় ‘ন ব্যয়’, অর্থাৎ যার কোন ব্যয় নেই।

যে পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। অর্থাৎ, যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে, যার সঙ্গে কোন বিভিন্ন যুক্ত হয় না এবং পুরুষ বা বচন বা লিঙ্গ ভেদে যে পদের রূপের বা চেহারারও কোন পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয় পদ বাক্যে কোন পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বাক্যকে আরো শ্রচতিমধূর করে, কখনো একাধিক পদ বা বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

বাংলা ভাষায় ও ধরনের অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হয়-

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হাঁ, না

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাত, অর্থাৎ, দৈবাত, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তত।

‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ এই দুটি অব্যয় শব্দও তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। তবে এ দুটি অব্যয় শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংস্কৃতে ‘এবং = এমন’ আর ‘সুতরাং = অত্যন্ত অবশ্য’ বাংলায় ‘এবং = ও’ আর ‘সুতরাং = অতএব’

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বছত, খুব, শাবাশ, থাসা, মাইরি, মারহাবা

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় পদ মূলত ৪ প্রকার-

১. সমুচ্ছয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্ছয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।

সংযোজক অব্যয় : উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। (উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (তাই অব্যয়টি ‘তিনি সৎ’ ও ‘সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে’ বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

এরকম- ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি।

বিয়োজক অব্যয় : আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। (আবুল, আব্দুল- এদের একজন করেছে, আরেকজন

করেনি। সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।)

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। (‘মন্ত্রের সাধন’ আর ‘শরীর পাতন’ বাক্যাংশ দুটির একটি

শুধু বিভিন্ন শব্দই না, মানুষ তাদের বিভিন্ন অনুভূতিকেও শব্দের আকারে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি প্রকাশের জন্য তারা বিভিন্ন শব্দ তৈরি করেছে। এগুলোও অনুকার অবয়।

যেমন-

ঝাঁ ঝাঁ (প্রথরতা)

খাঁ খাঁ (শুণ্যতা)

কচ কচ

কট কট

টল মল

ঝল মল

চক চক

ছম ছম

টন টন

খট খট

কিছু বিশেষ অবয়

১. অবয় বিশেষণ : কোন অবয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণের কাজ করলে, তাকে অবয় বিশেষণ বলে।

নাম বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ক্রিয়া বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

বিশেষণীয় বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

২. নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ : কিছু কিছু যুগ্ম অবয় আছে, যারা বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয়, এবং তাদের একটির অর্থ আরেকটির উপর নির্ভর করে। এদের নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ বলে। যেমন- যথা-তথা, যত-তত, যথন-তথন, যেমন-তেমন, যে ক্রপ-সে ক্রপ, ইত্যাদি। উদাহরণ-

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যেমন কর্ম তেমন ফল।

৩. ত প্রত্যয়ন্ত বিশেষণ : ত প্রত্যয়ন্ত কিছু তৎসম অবয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃততে প্রত্যয়টি ছিল ‘তস্’, বাংলায় তা হয়েছে ‘ত’। যেমন- ধৰ্মত, দুর্ভাগ্যবশত, অন্তত, জ্ঞানত, ইত্যাদি।

ক্রিয়া পদ

বাক্য :

বাক্য : কতোগুলো পদ সুবিন্যস্ত হয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে।

বাক্যে কতোগুলো পদ থাকে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে পদ বলে। এই বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দগুলো পরম্পর সম্পর্কিত হয়ে বাক্য গঠন করে। নয়তো বাক্য তৈরি হয় না। যেমন- আমা মা আমা অনেক আদর করে। এখানে মূল শব্দগুলো বিভক্তি ছাড়া সঠিক ক্রমে (ডঃফবৎ) সাজানো হলেও একটির সঙ্গে আরেকটি শব্দের কোন সম্পর্ক তৈরি হয়নি। শব্দগুলোতে বিভক্তি যুক্ত করলে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি হবে- আমার মা আমাকে অনেক আদর করে।

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। আর ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।

ভাষার বিচারে/ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি সার্থক বাক্যের ৩টি গুণ থাকতেই হবে/আবশ্যক- আকাঙ্ক্ষা, আসতি, যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষা : বাক্যে সম্পূর্ণ একটি মনোভাব থাকতে হবে। বাক্যের ভাব বা বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকলে সেটি বাক্য হবে না। যেমন- মা আমাকে অনেক...

বা মা আমাকে অনেক আদর...

উপরের কোন বাক্যই বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে না। দুটি বাক্য শেষ হওয়ার পরও আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, কোন বাক্যেরই আকাঙ্ক্ষা গুণটি নেই। তাই কোনটিই বাক্য নয়।
সম্পূর্ণ বাক্যটি হবে-

মা আমাকে অনেক আদর করে।

এটি শোনার পর আর কিছু শোনার আগ্রহ বাকি থাকছে না। সুতরাং এটি আকাঙ্ক্ষা গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, শ্রেতার সম্পূর্ণ বাক্য শোনার আগ্রহ-ই আকাঙ্ক্ষা।

আসতি : বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে/ অর্ডারে না সাজালে সেটি বাক্য হয় না। উপরের বাক্যের পদগুলো অন্যভাবে সাজালে সেটি বাক্য নাও হতে পারে। যেমন, উপরের বাক্যকে যদি এভাবে সাজালো হয়-

আমার অনেক মা আদর আমাকে করে।

এখানে বাক্যের প্রকৃত অর্থ যেমন বিকৃত হয়ে গেছে, তেমনি বিকৃত অর্থও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়নি।
সুতরাং, বাক্যের পদগুলোকেও সঠিক ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। বাক্যের এই বিন্যাসকেই আসতি বলে।
উপরের বাক্যটিকে সঠিক ক্রমে সাজালে হবে-

আমার মা আমাকে অনেক আদর করে।

এখানে বাক্যের পদগুলোর বিন্যাস বাক্যটির অর্থ সঠিক ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এটি আসতি
গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে (Order) বিন্যস্ত করে বক্তার মনোভাব সঠিক ও পরিষ্কার করে
বোঝানোর কৌশলই আসতি গুণ।

যোগ্যতা : বাক্যের অর্থ সঠিক ও পরিষ্কার করে বোঝাতে আকাঙ্ক্ষা ও আসতি গুণ ছাড়াও আরো একটি
বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। বাক্যের পদগুলো যদি পরস্পর অর্থগত ও ভাবগত দিক দিয়ে সম্পর্কিত না হয়,
তাহলেও সেটি সার্থক বাক্য হয় না। যেমন-

গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে পলাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

বাক্যটিতে আকাঙ্ক্ষা গুণও যেমন আছে, তেমনি এতে আসতি গুণও আছে। কিন্তু বাক্যটি সার্থক বাক্য নয়।
কারণ, গ্রীষ্মে বৃষ্টিই হয় না। সুতরাং, সেই বৃষ্টিতে পলাবনের প্রশ্নাই আসে না। সুতরাং, বাক্যের পদগুলোর মধ্যে
অর্থগত এবং ভাবগত কোনই মিল নেই। বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয়-

বর্ষার বৃষ্টিতে পলাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

তাহলে বাক্যটির পদগুলোর মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত মিল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এটি একটি যোগ্যতা গুণ
সম্পন্ন সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, বাক্যের শব্দগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিলকেই যোগ্যতা বলে।

বাক্যের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো জড়িত-

ক) গুরুতঙ্গলী দোষ : সংশিলিষ্ট দুটি শব্দের একটি তৎসম ও একটি তদ্ব শব্দ ব্যবহার করলে সেটি বাক্যের
যোগ্যতা গুণ নষ্ট করে। কারণ, তাতে পদগুলোর ভাবগত মিল নষ্ট হয়। একে গুরুতঙ্গলী দোষ বলে।

যেমন- ‘গন্তব্য গাড়ি’ শব্দদুটো সংশিলিষ্ট শব্দ এবং দুটিই খাঁটি বাংলা শব্দ। আমরা যদি একে ‘গন্তব্য শক্ট’
বলি, তা শুনতে যেমন বিশ্বী শোনায়, তেমনি শব্দদুটোর ভাবগত মিলও আর থাকে না। এটিই গুরুতঙ্গলী

দোষ। এরকম- ‘শবদাহ’কে ‘মড়াদাহ’ কিংবা ‘শবপোড়া’, ‘মড়াপোড়া’কে ‘শবপোড়া’ বা ‘মড়াদাহ’, বললে তা গুরুচঙ্গালী দোষ হবে।

অর্থাৎ, বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ব বা থাঁটি বাংলা শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করলে তাকে গুরুচঙ্গালী দোষ বলে।

খ) বাহল্য দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দের অর্থগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্যও যোগ্যতা গুণ হারায়।

শব্দকে বহুবচন করার সময় একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা একটি সাধারণ বাহল্য দোষ। অধিক জোর দেয়ার জন্য অনেক সময় এই কৌশল প্রয়োগ করা হলেও সাধারণ ক্ষেত্রে একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দটি বাহল্য দোষে দুষ্ট হয়। যেমন- ‘সব মানুষেরা’ বাহল্য দোষে দুষ্ট শব্দ। যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন বাক্যে ‘সব মানুষ’ বা ‘মানুষেরা’- এই দুটির যে কোন একটি ব্যবহার করতে হবে।

গ) উপমার ভুল প্রয়োগ : উপমা-অলংকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর প্রয়োগে কোন ভুল হলে বাক্য তার ভাবগত যোগ্যতা হারাবে। যেমন-

আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।

বাক্যটিতে উপমার ভুল প্রয়োগ হয়েছে। কারণ, বীজ মন্দিরে উপ্ত হয় না/ বপন করা হয় না। বীজ বপন করা হয় ক্ষেত্রে। সুতরাং বলতে হবে-

আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

ঘ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারা ভাষার একটি প্রতিহ্য। বাংলা ভাষাতেও অসংখ্য বাগধারা প্রচলিত আছে। এসব বাগধারা ব্যবহার করার সময় এগুলোর কোন পরিবর্তন করলে বাগধারার ভাবগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। সুতরাং, যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য তৈরি করতে বাগধারা সঠিকভাবেই লিখতে হবে।

যেমন- যদি বলা হয়, ‘অরণ্যে ক্রল্দন’, তাহলে গুরুচঙ্গালী দোষও হয় না। কিন্তু বাগধারাটির শব্দ পরিবর্তন করার কারণে এটি তার ভাবগত যোগ্যতা হারিয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য গঠন করতে হলে প্রচলিত বাগধারাটিই লিখতে হবে। অর্থাৎ, ‘অরণ্যে রোদন’ই লিখতে হবে।

ঙ) দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট করে। যেমন-এ কী প্রপঞ্চ!

বাক্যটির প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত, একই সঙ্গে দুর্বোধ্য। তাই বাক্যটির অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে বাক্যের পদগুলোর মধ্যের অর্থগত মিলবন্ধন বিনষ্ট হয়েছে। তাই এটি কোন যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য হতে পারেনি।

চ) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, শব্দগুলো যাতে তাদের রীতিসিদ্ধ অর্থ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ ভিন্ন হলে, অবশ্যই রীতিসিদ্ধ অর্থে শব্দ ব্যবহার করতে হবে। নয়তো শব্দটির সঙ্গে বাক্যের অন্য শব্দগুলোর অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট হবে। যেমন-

‘বাধিত’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘বাধাপ্রাপ্ত’। আর ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ হলো ‘কৃতজ্ঞ’। শব্দটি ব্যবহারের সময় কৃতজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। নয়তো তা অর্থ বিকৃত করবে। ফলে বাক্যটি যোগ্যতা গুণ হারাবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
বাকে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে।
বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাই বিধেয়।
যেমন- বইটি খুব ভালো।

বাক্যটিতে বইটি' সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং, এখানে 'বইটি' উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, 'বইটি' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'খুব ভালো'। এই 'খুব ভালো' বাক্যটির বিধেয় অংশ।

উদ্দেশ্য অংশ একটি শব্দ না হয়ে একটি বাক্যাংশও হতে পারে। এবং সেই শব্দ বা বাক্যাংশটি শুধু বিশেষ-ই হবে, এমন কোন কথাও নেই। উদ্দেশ্য বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন বাক্যাংশ, এমনকি ক্রিয়াভাবাপন্ন বাক্যাংশও হতে পারে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়
সৎ হওয়া	খুব কঠিন। (এখানে ক্রিয়াভাবাপন্ন বাক্যাংশ উদ্দেশ্য)
সৎ লোকেরাই	প্রকৃত সুরী। (এখানে বিশেষণভাবাপন্ন বাক্যাংশ উদ্দেশ্য)

বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

বাক্যের প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে বাক্যকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

বিবৃতিমূলক বাক্য: কোন কিছু সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয় যে বাক্যে, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে।
বিবৃতিমূলক বাক্য ২ প্রকার।

ক) অস্তিবাচক বাক্য/ হাঁ বাচক বাক্য: যে বাক্যে সমর্থনের মাধ্যমে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বা হাঁ বাচক বলে।

যে বাক্যে হাঁ বাচক শব্দ থাকে, তাকে হাঁ বাচক বা অস্তিবাচক বাক্য বলে।

যেমন- তুমি কালকে আসবে।

আমি ঢাকা যাব।

[সদর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য : এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন :

বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা জিতেছে।

আজ দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

ভাষা অনুশীলন; হৈমন্তী]

খ) নেতিবাচক বাক্য/ না বাচক বাক্য: যে বাক্যে অসমর্থনের মাধ্যমে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বা না বাচক বলে।

যে বাক্যে না বাচক শব্দ থাকে, তাকে নেতিবাচক বাক্য বা না বাচক বাক্য বলে।

যেমন- তুমি কালকে আসবে না।

আমি ঢাকা যাব না।

[নেতিবাচক বা নগ্নর্থক বাক্য : এ ধরনের বাক্যে কোন কিছু হয় না বা ঘটে না- নিষেধ, আকাঙ্ক্ষা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন :

আজ ট্রেন চলবে না।

আপনি আমার সঙে কথা বলবেন না।

অস্তিবাচক- নেতিবাচক বাক্যের ক্রপাত্তির

[**বাক্য রূপান্তর** : বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়। অর্থাৎ, বাক্য রূপান্তর করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাক্যের অর্থ যেন পাল্টে না যায়। বাক্যের অর্থ পাল্টে গেলে বাক্যটি অন্য বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতি তথা রূপ (Form) পরিবর্তন করতে হবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।]

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

ক) বিশেষণ পদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অনেক অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : তুমি খুব ভাল।

নেতিবাচক বাক্য : তুমি মোটেও খারাপ নও। (ভাল- খারাপ)

খ) ‘না করলেই নয়’, ‘না করে পারবো না’ ইত্যাদি বাক্যাংশ যোগ করে অনেক অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : তুমি কালকে আসবে।

নেতিবাচক বাক্য : তুমি কালকে না আসলেই নয়।

অস্তিবাচক বাক্য : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি এতো ভাল, তুমি আবার চুকবেই।

নেতিবাচক বাক্য : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি এতো ভাল, তুমি আবার না চুকে পারবেই না।

গ) নতুন কোন বিপরীতার্থক বা নগ্নার্থক (না বোধক) শব্দ যোগ করে। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : সে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকল।

নেতিবাচক বাক্য : সে বইয়ের পাতা উল্টানো বন্ধ রাখলো না।

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

ক) বিশেষণ পদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অনেক নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

নেতিবাচক বাক্য : সে ক্লাশে উপস্থিত ছিল না।

অস্তিবাচক বাক্য : সে ক্লাশে অনুপস্থিত ছিল।

খ) নেতিবাচক বাক্যের না বোধক বাক্যাংশকে কোন বিপরীতার্থক বিশেষণে রূপান্তর করেও অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

নেতিবাচক বাক্য : দেৰাচনার কথা তিনি কোনদিন চিন্তাও করেন নি।

অস্তিবাচক বাক্য : দেৰাচনার কথা তার কাছে অচিন্ত্যীয় ছিল।

নেতিবাচক বাক্য : এসব কথা সে মুখেও আনতে পারত না।

অস্তিবাচক বাক্য : এসব কথা তার কাছে অকথ্য ছিল।

গ) নতুন কোন অস্তিবাচক বিপরীতার্থক শব্দ যোগ করে। যেমন-

নেতিবাচক বাক্য : মা জেগে দেখে খোকা তার পাশে নেই।

অস্তিবাচক বাক্য : মা জেগে দেখে খোকা তার পাশে অনুপস্থিত।

প্রশ্নসূচক বাক্য : যে বাক্যে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন-

তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

মূলত প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক থেকে সরাসরি নেতিবাচক বাক্যে পরিণত করলেই নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেবল প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক হিসেবে কল্পনা করতে হয়। আর যেগুলো সরাসরি অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে অস্তি-নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের নিয়মে নেতিবাচক করতে হয়। যেমন-

প্রশ্ন : তুমি কি কালকে স্কুলে এসেছিলে?

নেতি : তুমি কালকে স্কুলে আসোনি।

প্রশ্ন : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি কি পড়াশোনা করার জন্য খারাপ?

নেতি : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি পড়াশোনা করার জন্য খারাপ না।

প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখেনি?

নেতি : তুমি ছবিটা না দেখে পারোনি।

প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

কিছু প্রশ্নবাচক বাক্যকে স্বাভাবিকভাবে সরাসরি অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নবাচকে রূপান্তরিত করা যায়। আর যেগুলো সরাসরি রূপান্তর করলে নেতিবাচক হয়, সেগুলোকে নেতি থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের নিয়মে অস্তিবাচক করতে হয়। যেমন-

প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখেনি?

অস্তি : তুমি ছবিটা দেখেছো।

প্রশ্ন : তুমি কি কালকে স্কুলে এসেছিলে?

অস্তি : তুমি কালকে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলে।

অস্তি-নেতিবাচক (বিবৃতিমূলক) বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর

বিবৃতিমূলক বাক্যে প্রশ্নসূচক অব্যয় যুক্ত করে সেগুলোকে বিপরীত বাক্যে (অস্তি হলে নেতি এবং নেতি হলে অস্তিবাচকে) সরাসরি রূপান্তর করলেই বাক্য রূপান্তর সম্পন্ন হয়। যেমন-

বিবৃতি : তুমি কালকে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলে।

প্রশ্নসূচক অব্যয় যুক্ত করে : তুমি কি কালকে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলে?

প্রশ্ন : তুমি কি কালকে স্কুলে উপস্থিত ছিলে?/ তুমি কি কালকে স্কুলে এসেছিলে?

বিবৃতি : তুমি ছবিটা দেখেনি।

প্রশ্নসূচক অব্যয় যুক্ত করে : তুমি কি ছবিটা দেখেনি?

প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখেছো?

বিস্ময়সূচক বাক্য : যে বাক্যে আশ্চর্য হওয়ার অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন-

সে কী ভীষণ ব্যাপার!

ইচ্ছাসূচক বাক্য : যে বাক্যে শুভেচ্ছা, প্রার্থণা, আশীর্বাদ, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন-

তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করচন। ভালো থেকো।

আদেশ বাচক বাক্য : যে বাক্যে আদেশ করা হয়, তাকে আদেশ সূচক বাক্য বলে। যেমন-

বের হয়ে যাও। ওখানে বসো। জানালা লাগাও। সবসময় দেশের কথা মাথায় রেখে কাজ করবে।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

গঠন অনুযায়ী বাক্য ৩ প্রকার- সরল বাক্য, জটিল বা মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য : যে বাকে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।
যেমন-

পুরুরে পদ্ম ফোটে। (উদ্দেশ্য- পুরুরে, সমাপিকা ক্রিয়া- ফোটে)

মা শিশুকে ভালোবাসে। (উদ্দেশ্য- মা, সমাপিকা ক্রিয়া- ভালোবাসে)

ছেলেরা মাঠে খেলতে হঠাতে করে সবাই মিলে গাইতে শুরু করলে বড়ো ওদেরকে আচ্ছামত বকে দিল। (উদ্দেশ্য- বড়ো, সমাপিকা ক্রিয়া- (বকে) দিল) (অন্য ক্রিয়াগুলোর সবগুলোই অসমাপিকা ক্রিয়া। তাই সেগুলো বাক্যের গঠনে কোনো প্রভাব ফেলে না।)

সরল বাক্য চেনার সহজ উপায় হলো, সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। কারণ, সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না।

জটিল বা মিশ্র বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও তাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

জটিল বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান থাকে, এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি খ-বাক্যের পরে কমা (,) বসে। যেমন-

যে পরিশ্রম করে, / সে-ই সুখ লাভ করে। (প্রথম অংশটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য, দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য)

যত পড়বে, / তত শিখবে, / তত ভুলবে। (প্রথম দুটি অংশ আশ্রিত খণ্ডবাক্য, শেষ অংশটি প্রধান খণ্ডবাক্য)

জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার সহজ উপায় হল, এ ধরনের বাক্যে সাধারণত যে- সে, যত- তত, যারা- তারা, যদের- তাদের, যখন- তখন - এ ধরনের সাপেক্ষ সর্বনাম পদ থাকে। দুইটি অবয় যদি অর্থ প্রকাশের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভর করে, তবে তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। আবার যদি- তবু, অথচ- তথাপি- এ রকম কিছু পরস্পর সাপেক্ষ সর্বনাম/অব্যয়ও জটিল/মিশ্র বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তবে এ ধরনের অবয় ছাড়াও জটিল বা মিশ্র বাক্য হতে পারে।

যৌগিক বাক্য : একাধিক সরল বাক্য কোন অবয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন-

তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য দুটি- তার বয়স হয়েছে, তার বুদ্ধি হয়নি)

সে খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। (সরল বাক্য দুটি- সে খুব শক্তিশালী, সে খুব বুদ্ধিমান)

যৌগিক বাক্যে এবং, ও, আর, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি- এই অব্যয়গুলো দিয়ে দুটি সরল বাক্য যুক্ত হয়। এগুলো দেখে সহজেই যৌগিক বাক্যকে চেনা যেতে পারে। তবে কোন অবয় ছাড়াও দুটি সরল বাক্য একসঙ্গে হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করতে পারে।

[একাধিক বাক্য বা খণ্ড বাক্য নিয়ে কোনো বাক্য তৈরি হলে এবং খণ্ড বাক্যগুলোর মধ্যে পেরস্পর নির্ভরতা থাকলে ত্রি ধরনের বাক্যকে জটিল বাক্য বলে।]

সরল-জটিল-যৌগিক বাক্যের রূপান্তর

[বাক্য রূপান্তর] : বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়। অর্থাৎ, বাক্য রূপান্তর করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাক্যের অর্থ যেন পাল্টে না যায়। বাক্যের অর্থ পাল্টে গেলে বাক্যটি অন্য বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতি তথা রূপ (Form) পরিবর্তন করতে হবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।]

সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর : সরল বাক্যের কোন একটি অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি খণ্ডবাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং তার খণ্ডবাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয়গুলোর কোনটি ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

সরল বাক্য : ভাল ছেলেরা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

জটিল বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

সরল বাক্য : ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

জটিল বাক্য : যে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা দাও।

জটিল থেকে সরল বাক্যে ক্লিপার : জটিল বাক্যটির অপ্রধান/ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে একটি শব্দ বা শব্দাংশে পরিণত করে সরল বাক্যে ক্লিপার করতে হয়। যেমন-

জটিল বাক্য : যত দিন বেঁচে থাকব, এ কথা মনে রাখব।

সরল বাক্য : আজীবন এ কথা মনে রাখব।

জটিল বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

সরল বাক্য : দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

সরল থেকে যৌগিক বাক্যে ক্লিপার : সরল বাক্যের কোন অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণ বাক্যে ক্লিপারিত করতে হয় এবং পূর্ণ বাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

সরল বাক্য : দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না। (এক্ষেত্রে ‘তাহলে’ অব্যয়টি ব্যবহার না করলেও চলতো)

সরল বাক্য : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্টে এবং/ ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক থেকে সরল বাক্যে ক্লিপার : যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অন্যদিকে সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই যৌগিক বাক্যের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাকিগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। যৌগিক বাক্যে একাধিক পূর্ণ বাক্য থাকে এবং তাদের সংযোগ করার জন্য একটি অব্যয় পদ থাকে। সেই অব্যয়টি বাদ দিতে হবে। যেমন-

যৌগিক বাক্য : তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সমাপিকা ক্রিয়া- হয়েছে, হয়নি)

সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। (‘হয়েছে’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘হলেও’ অসমাপিকা ক্রিয়ায় ক্লিপারিত করা হয়েছে)

যৌগিক বাক্য : মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ুর ভূত্য করে। (সমাপিকা ক্রিয়া- করে ও করে)

সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ুর ভূত্য করে। (‘করে’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘করলে’ অসমাপিকা ক্রিয়ায় ক্লিপারিত করা হয়েছে)

[সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া; ক্রিয়াপদ]

জটিল থেকে যৌগিক বাক্যে ক্লিপার : জটিল বাক্যে কয়েকটি খণ্ডবাক্য থাকে, এবং সেগুলো পরস্পর নির্ভরশীল থাকে। জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে ক্লিপার করতে হলে এই খণ্ডবাক্যগুলোর পরস্পর নির্ভরতা মুছে দিয়ে স্বাধীন করে দিতে হবে। এজন্য সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলো তুলে দিয়ে যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে উপরোক্ত অব্যয়টি বসাতে হবে। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে ধ্যেয়াল রাখতে হবে। যেমন-

জটিল বাক্য : যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

জটিল বাক্য : যদিও তাঁর টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।

যৌগিক বাক্য : তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

যৌগিক থেকে জটিল বাক্যে ক্লিপ্টর : যৌগিক বাক্যে দুইটি পূর্ণ বাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই অব্যয়টি তুলে দিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়ের প্রথমটি প্রথম বাক্যের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বাক্যের পূর্বে বসালেই জটিল বাক্যে ক্লিপ্টরিত হবে।

তবে, সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলোর পূর্ণ বাক্য দুটির প্রথমেই বসাতে হবে, এমন কথা নেই; উপর্যুক্ত যে কোন জায়গাতেই বসালো যেতে পারে। যেমন-

যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য : তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তার হন্দয় অত্যন্ত মহৎ।

জটিল বাক্য : যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তবুও তার হন্দয় অত্যন্ত মহৎ।

যৌগিক বাক্য : এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

জটিল বাক্য : এ গ্রামে যে দরগাহটি আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।

ভাষা অনুশীলন; ১ম পত্র থেকে

শকুন্তলা

ক) নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে ক্লিপ্টর

নেতি : এ আশ্রমমূগ, বধ করিবেন না।

অস্তি : এ আশ্রমমূগ, বধ করা থেকে বিরত হোন।

নেতি : আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিষ্ক্রিপ্ত হইবার যোগ্য নহে।

অস্তি : আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিষ্ক্রিপ্ত হইবার অযোগ্য।

নেতি : না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই।

অস্তি : হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাইরে আছেন।

(বাক্যের শুরুতে 'না' শব্দটি না থাকলে 'তিনি আশ্রমে অনুপস্থিত' হতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রে 'অনুপস্থিত' বলতে গেলে শুরুতে 'না' বলতে হবে। তখন বাক্যটি আর অস্তিবাচক হবে না, কারণ নেতিবাচক শব্দ 'না' বাক্যে থেকে যাবে। তাই এক্ষেত্রে সেটি সঠিক হবে না।)

নেতি : কেহ কহিয়া দিতেছে না।

অস্তি : সকলে জীরব থাকিতেছে।

নেতি : একপ ক্লিপ্টরতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

অস্তি : আমার অন্তঃপুর একপ ক্লিপ্টরতী রমণী-বিবর্জিত।

খ) অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে ক্লিপ্টর

অস্তি : উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল।

নেতি : উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত না হইয়া পারিল না।

অস্তি : কংগ আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন।

নেতি : কংগ আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক না ভালোবাসিয়া পারেন না।

অস্তি : আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে।

নেতি : আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।

অস্তি : এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে।

নেতি : এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলে পারে না।

অস্তি : প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।

নেতি : প্রিয়ংবাদ অযথার্থ কহে নাই।

গ) জটিল থেকে সরল বাক্যে ক্রপান্তর

জটিল : কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সরল : কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

জটিল : শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন।

সরল : শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন।

জটিল : যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।

সরল : কার্যক্ষতি না হইলে তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।

জটিল : ইহারা যেরূপ একুশ ক্রপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

সরল : ইহাদের মতো ক্রপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

জটিল : তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

সরল : তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা হওয়া সঙ্গেও তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কমলাকান্তের জবানবন্দী

সরল থেকে জটিল বাক্যে ক্রপান্তর

সরল : ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী।

জটিল : যে ফরিয়াদী, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।

সরল : সাক্ষীটা কী একটা গওগোল বাধাইতেছে।

জটিল : যে সাক্ষী, সে একটা গওগোল বাধাইতেছে।

সরল : আমার নিবাস নাই।

জটিল : যা নিবাস, তা আমার নাই।

সরল : তোমার বাপের নাম কী?

জটিল : তোমার যিনি বাপ, তার নাম কী?

সরল : আমি এ সাক্ষী চাই না।

জটিল : যে সাক্ষী এ রকম, তাকে আমি চাই না।

সরল : কমলাকান্ত পিতার নাম বলল।

জটিল : যিনি কমলাকান্তের পিতা, সে তাঁর নাম বলল।

সরল : কোনো কথা গোপন করিব না।

জটিল : যাহা বলিব, তাহার মধ্যে কোনো কথা গোপন করিব না।

সরল : উকিলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জটিল : যিনি উকিলবাবু, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হৈমন্তী

ক) অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে ক্লপান্তর

অস্তি : বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

নেতি : বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল না।

অস্তি : পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল।

নেতি : পঞ্জিকার পাতা উল্টাগো বন্ধ রাখিল না।

অস্তি : শ্বশুরের ও তাহার মনিবের উপর রাগ হইল।

নেতি : শ্বশুরের ও তাহার মনিবের উপর রাগ না হইয়া পারিলাম না।

অস্তি : আমার বুকের ভেতরটা হ হ করিয়া উঠিল।

নেতি : আমার বুকের ভেতরটা হ হ করিয়া না উঠিয়া পারিল না।

অস্তি : হৈমন্তী চুপ করিয়া রাখিল।

নেতি : হৈমন্তী কোনো কথা কহিতে পারিল না।

অস্তি : হৈম কিছু না বলিয়া একটু হাসিল।

নেতি : হৈম কিছু একটু হাসিল, কিছু বলিল না।

অস্তি : সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে দেখাইত।

নেতি : সে বাপকে যত চিঠি লিখিত সেগুলি আমাকে না দেখাইয়া পারিত না।

অস্তি : তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

নেতি : তাহার মন কাঠ না হইয়া পারিল না।

খ) নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে ক্লপান্তর

নেতি : দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার আস্থা ছিল না।

অস্তি : দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার অনাশ্চা ছিল।

নেতি : আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না।

অস্তি : আমার প্রণাম লইবার পূর্বেই প্রস্থান করিলেন।

নেতি : কিন্তু বরফ গলিল না।

অস্তি : কিন্তু বরফ অগলিত রাখিল।

নেতি : হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।

অস্তি : হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম।

নেতি : দেবাচনার কথা কোনদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।

অস্তি : দেবাচনার কথা তাঁর কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল।

নেতি : এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।

অস্তি : এসব কথা তার মুখে আনারও যোগ্য ছিল না।

নেতি : বইগুলি হৈমের সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

অস্তি : বইগুলি হৈমের সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া সম্ভব ছিল।

নেতি : দেখি, সে বিচানায় নাই।

অস্তি : দেখি, সে বিচানায় অনুপস্থিত।

গ) যৌগিক থেকে সরল বাক্যে ক্লপাত্তর

যৌগিক : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

সরল : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

যৌগিক : আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

সরল : আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

যৌগিক : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ঘোলো হইলেও সেটা ছিল স্বভাবের ঘোলো।

সরল : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ঘোলো হইলেও সেটা ছিল স্বভাবের ঘোলো।

যৌগিক : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রাখিল।

সরল : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলেও তোমার হাতেই ও রাখিল।

বিলাসী

ক) নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবাচক বাক্যে ক্লপাত্তর

নেতি : তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

প্রশ্ন : তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

নেতি : এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।

প্রশ্ন : এ খবর আমদের কেহই কি জানিত?

নেতি : মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

প্রশ্ন : মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?

নেতি : সরস্বতী বর দেবেন না।

প্রশ্ন : সরস্বতী বর দেবেন কি?

নেতি : তাদের সে আলা নাই।

প্রশ্ন : তাদের সে আলা আছে কি?

নেতি : তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই।

প্রশ্ন : তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনিয়াছি কি?

নেতি : একথা কোনো বাপ ভদ্রসমাজে কবুল করিতে চাহিত না।

প্রশ্ন : একথা কোনো বাপ ভদ্রসমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?

নেতি : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।

প্রশ্ন : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো দেখা আছে কি?

খ) প্রশ্নবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

প্রশ্ন : তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন?

অস্তি : তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন জানিতে চাই।

প্রশ্ন : কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কি?

অস্তি : কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী তা জানতে চাই।

প্রশ্ন : একলা যেতে ভয় করবে না তো?

অস্তি : একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।

গ) প্রশ্নবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

প্রশ্ন : পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?

নেতি : পুলিশের লোক জানিবে না।

প্রশ্ন : তাহারা কি পাষাণ?

নেতি : তাহারা পাষাণ নয়।

প্রশ্ন : এতে দোষ কী?

নেতি : এতে দোষ নেই।

প্রশ্ন : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ?

নেতি : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের তো কিছু না। তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ তাহারা বুঝিবে। তাহাদের ঘরেও তো স্ত্রী আছে। তাহারা তো পাষাণ নয়।

কলিমদি দফাদার

ক) অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর

অস্তি : কোথাও তঙ্গ অদৃশ্য হয়ে যায়।

নেতি : কোথাও তঙ্গ অদৃশ্য না হয়ে যায় না।

অস্তি : কাঠের পুলের অবস্থাও ওরকম।

নেতি : কাঠের পুলের অবস্থাও অন্যরকম নয়।

অস্তি : ধান চালের দাম বাড়লে উপোস করতে হয়।

নেতি : ধান চালের দাম বাড়লে উপোস না করে চলে না।

অস্তি : যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি�।

নেতি : যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন না করলেই নয়।

অস্তি : আজ গ্রামটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

নেতি : আজ গ্রামটাকে শায়েস্তা না করলেই নয়।

অস্তি : আম্বরক্ষা করতে হবে।

নেতি : আম্বরক্ষা না করলেই নয়।

অস্তি : সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়।

নেতি : সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা না দিলে চলে না।

অস্তি : একটি বাঁশও উধাও হয়ে গেছে।

নেতি : একটি বাঁশও নেই।

খ) নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতি : এক পা দু পা করে না এগিয়ে পারে না।

অস্তি : এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতেই হয়।

নেতি : তঙ্গসুন্দরী সে নিচে না পড়ে পারল না।

অস্তি : তঙ্গসুন্দরী সে নিচে পড়ে গেল।

নেতি : কলিমদি সে সব জানে না।

অস্তি : কলিমদির সে সব অজানা।

নেতি : সে গুলি চালানোয় অভ্যন্তর নয়।

অস্তি : সে গুলি চালানোয় অনভ্যন্তর।

নেতি : সে সাঁতার জানে না।

অস্তি : সে সাঁতার কাটতে অক্ষম।/সে সাঁতার সম্পর্কে অজ্ঞ।

নেতি : কলিমদি কারো কাছে হাত পাতে না।

অস্তি : কলিমদ্দি কারো কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে।

নেতি : থান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না।

অস্তি : থান সেনাদের কাছে সেটা রহস্যই থেকে যায়।

নেতি : আশেপাশে কোন শব্দ নেই।

অস্তি : চারপাশ নিঃশব্দ/শব্দহীন।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

ক) অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক বাক্যে ক্লপান্তর

অস্তি : সে কথাই এরা ভাবে।

নেতি : সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।

অস্তি : বাড়িটা তারা দখল করেছে।

নেতি : বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়ে না।

অস্তি : কথাটায় তার অবিশ্বাস হয়।

নেতি : কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।

অস্তি : তবে নালিশটা অযৌক্তিক।

নেতি : তবে নালিশটা যৌক্তিক নয়।

অস্তি : সে তারস্বরে আর্তনাদ করে।

নেতি : সে তারস্বরে আর্তনাদ না করে পারে না।

খ) নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্যে ক্লপান্তর

নেতি : তারা যাবে না কোথাও।

অস্তি : তারা এখানেই থাকবে।

নেতি : কারো মুখে কোন কথা সরে না।

অস্তি : প্রত্যেকেই নীরব হয়ে থাকে।

নেতি : সেখানে কেউ নেই।

অস্তি : জায়গাটা নিজেন।

নেতি : কথাটা না মেনে উপায় নেই।

অস্তি : কথাটা মানতেই হয়।

নেতি : তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।

অস্তি : অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে।

নেতি : সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটার যন্ত্র নিচে কেউ।

অস্তি : এটা নিশ্চিত যে তুলসী গাছটার যন্ত্র নিচে কেউ।

নেতি : সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।

অস্তি : তাকে একটু বিস্মিত হতেই হয়।

নেতি : গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না।

অস্তি : গাছটি উপড়াতে সবার হাত নিষ্ক্রিয় থাকে।/সবাই গাছটি উপড়াতে নিষ্ক্রিয় থাকে।

নেতি : হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।

অস্তি : হয়তো তার যাত্রা এখনো চলছে।

নেতি : হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভাল জানা নেই।

অস্তি : হিন্দু রীতিনীতি এদের কাছে অনেকটাই অজানা।

একুশের গল্প

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর

নেতি : ওকে চেনাই যায় না।

অস্তি : ওকে চিনতে আমরা অক্ষম।

নেতি : এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

অস্তি : এ অবস্থায় সবাই সবাইকে চিনতে অক্ষম।

নেতি : এ কথা ভুলেও ভাবি নি কোনদিন।

অস্তি : এ কথা সবসময়ই আমার ভাবনার অভীত ছিল।

নেতি : ওদের কাউকে পাওয়া যায় নি।

অস্তি : ওর সবাই নিখোঁজ।

নেতি : আমরা বাধা দিতে পারলাম না।

অস্তি : আমরা বাধা দিতে অক্ষম ছিলাম।

নেতি : আমরা নড়লাম না।

অস্তি : আমরা অনড় থাকলাম।

বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ:

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংকোচন, বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ বলে। অর্থাৎ একটিমত্র শব্দ দিয়ে যখন একাধিক পদ বা একটি বাক্যাংশের (উপবাক্য) অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাক্য সংকোচন বলে।

যেমন- হীরক দেশের রাজা- হীরকরাজ

এখানে হীরকরাজ- শব্দের মাধ্যমে হীরক দেশের রাজা- এই তিনটি পদের অর্থই সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি পদ একত্রে একটি বাক্যাংশ বা উপবাক্যও বটে। অর্থাৎ, হীরক দেশের রাজা- তিনটি পদ বা বাক্যাংশটির বাক্য সংকোচন হল- হীরকরাজ।

କିଛୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ସଂକୋଚନ/ଏକ କଥାଯ ପ୍ରକାଶ

ଅକାଲେ ପେକେଛେ ଯେ- ଅକାଲପକ୍ଷ
ଅଞ୍ଚିର ସମ୍ମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ- ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଆଛେ ଯାର- ଅନଭିଜ୍ଞ
ଅହଂକାର ନେଇ ଯାର- ନିରହଂକାର
ଅସ୍ଵେର ଡାକ- ତ୍ରେସା
ଅତି କର୍ମନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି- ଦକ୍ଷ
ଅନୁମଞ୍ଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା- ଅନୁମଞ୍ଜିତ୍ସା
ଅନୁମଞ୍ଜନ କରିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ- ଅନୁମଞ୍ଜିତ୍ସୁ
ଅପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା- ଅପଚିକିର୍ଯ୍ୟ
ଅଗ୍ରପଶ୍ଚାଂ ବିବେଚନା ନା କରେ କାଜ କରେ ଯେ- ଅବିମ୍ୟକାରୀ
ଅତି ଶୀତଳ ନୟ, ଅତି ଉଷ୍ଣ ନୟ- ନାତିଶୀତୋଷ
ଅବଶ୍ୟ ହବେ/ଘଟବେ ଯା- ଅବଶ୍ୟକ୍ଷାରୀ
ଅତି ଦୀର୍ଘ ନୟ ଯା- ନାତିଦୀର୍ଘ
ଅତିକ୍ରମ କରା ଯାଯ ନା ଯା- ଅନତିକ୍ରମନୀୟ/ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ
ଯା ସହଜେ ଅତିକ୍ରମ କରା ଯାଯ ନା- ଦୂରତିକ୍ରମନୀୟ/ଦୂରତିକ୍ରମ୍ୟ
ଅଗ୍ରେ ଜନ୍ମେଛେ ଯେ- ଅଗ୍ରଜ
ଅନୁତୋ/ପଶ୍ଚାତୋ/ପରେ ଜନ୍ମେଛେ ଯେ- ଅନୁଜ
ଅରିକେ ଦମନ କରେ ଯେ- ଅରିନ୍ଦମ
ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନେଇ ଯାର- ଅନନ୍ୟୋପାୟ
ଅନେକର ମାବେ ଏକଜନ- ଅନ୍ୟତମ
ଅନ୍ୟ ଗାଛେର ଓପର ଜନ୍ମେ ଯେ ଗାଛ- ପରଗାଛା
ଆଚାରେ ନିର୍ତ୍ତା ଆଛେ ଯାର- ଆଚାରନିର୍ତ୍ତ
ଆପନାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଚିନ୍ତା ଯାର- ଆମ୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀକ
ଆକାଶେ ଚରେ ଯେ- ଥେଚର
ଆକାଶେ ଗମନ କରେ ଯେ- ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ
ଆଟ ପ୍ରହର ଯା ପରା ଯାୟ- ଆଟପୌରେ
ଆପନାର ରଂ ଲୁକାୟ ଯେ/ଯାର ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରା ଯାଯ ନା- ବର୍ଣ୍ଣଚୋରା
ଆୟ ଅନୁମାରେ ବ୍ୟାୟ କରେ ଯେ- ମିତବ୍ୟୟ
ଆପନାକେ ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରେ ଯେ- ପଣ୍ଡିତମ୍ବଳ୍ୟ
ଆଦି ଥେକେ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ- ଆଦ୍ୟନ୍ତ
ଇତିହାସ ରଚନା କରେନ ଯିନି- ପ୍ରତିହାସିକ
ଇତିହାସ ବିଷୟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଯିନି- ଇତିହାସବେତୋ
ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଜୟ କରେଛେ ଯେ- ଇନ୍ଦ୍ରଜିଃ
ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେ ଜୟ କରେଛେ ଯେ- ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ
ଈଶ୍ୱରେର ଆସ୍ତିଷ୍ଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଛେ ଯାର- ଆସ୍ତିକ
ଈଶ୍ୱରେର ଆସ୍ତିଷ୍ଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯାର- ନାସ୍ତିକ
ଈସ୍ଵ ଆମିଷ/ଆଁଷ ଗନ୍ଧ ଯାର- ଆଁଷଟେ
ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା- ଉପଚିକିର୍ୟ
ଉପକାରୀର ଉପକାର ସ୍ଥିକାର କରେ ଯେ- କୃତଜ୍ଞ
ଉପକାରୀର ଉପକାର ସ୍ଥିକାର କରେ ନା ଯେ- ଅକୃତଜ୍ଞ

উপকারীর অপকার করে যে- কৃতম
একই সময়ে বর্তমান- সমসাময়িক
একই মায়ের সন্তান- সহোদর
এক থেকে আরম্ভ করে- একাদিক্রমে
একই গুরুর শিষ্য- সতীর্থ
কথায় বর্ণনা যায় না যা- অনিবচ্ছিন্ন
কোনভাবেই নিবারণ করা যায় না যা- অনিবার্য
সহজে নিবারণ করা যায় না যা/কষ্টে নিবারণ করা যায় যা- দুর্নিবার
সহজে লাভ করা যায় না যা/কষ্টে লাভ করা যায় যা- দুর্লভ
কোন কিছুতেই ভয় নেই যার- নিতীক, অকুতোভয়
ক্ষমার যোগ্য- ক্ষমার্হ
কট জানতে না পারে এমনভাবে- অজ্ঞাতসারে
গোপন করার ইচ্ছা- জুগন্না
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত- চাক্ষুষ
চৈত্র মাসের ফসল- চৈতালি
জীবিত থেকেও যে মৃত- জীবন্মৃত
জানার ইচ্ছা- জিজ্ঞাসা
জানতে ইচ্ছুক- জিজ্ঞাসু
অস্ত জ্বল করছে যা- জাস্ত্বল্যমান
জয় করার ইচ্ছা- জিগীষা
জয় করতে ইচ্ছুক- জিগীষু
জানু পর্যন্ত লক্ষ্যিত- আজানুলক্ষ্যিত
তল স্পর্শ করা যায় না যার- অতলস্পর্শী
তীর ছোঁড়ে যে- তীরন্দাজ
দিনে যে একবার আহার করে- একাহারী
দীঘি পাছে যা- দীপ্যমান
দুঃবার জন্মে যে- দ্বিজ
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার- নশ্বর
নদী মেখলা যে দেশের- নদীমেখলা
নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে- নাবিক
নিজেকে যে বড়ো মনে করে- হামবড়া
নূপুরের ধূমনি- নিঙ্কণ
পা থেকে মাথা পর্যন্ত- আপাদমস্তুক
প্রিয় বাক্য বলে যে নারী- প্রিয়ংবদা
পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে- জাতিস্মর
পান করার যোগ্য- পেয়
পান করার ইচ্ছা- পিপাসা
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়- ওষধি
বিদেশে থাকে যে- প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর- বিশ্বজনীন
ব্যাকরণ জানেন যিনি- বৈয়াকরণ
বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণায় রাত যিনি- বৈজ্ঞানিক

বেদ-বেদান্ত জানেন যিনি- বৈদান্তিক
বয়সে সবচেয়ে বড়ো যে- জোর্জ
বয়সে সবচেয়ে ছোটো যে- কনিষ্ঠ
ভোজন করার ইচ্ছা- বুভুক্ষা
মৃতের মত অবস্থা যার- মুমুর্শু
মুষ্টি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায়- মুষ্টিমেয়
মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত- মৃত্তয়
মর্মকে পীড়া দেয় যা- মর্মক্ষুদ
মাটি ভেদ করে ওঠে যা- উদ্বিদ
মৃত গবাদি পশু ফেলা হয় যেখানে- ভাগাড়
মন হরণ করে যা- মনোহর
মন হরণ করে যে নারী- মনোহারিণী
যা দমন করা যায় না- অদম্য
যা দমন করা কষ্টকর- দুর্দমনীয়
যা নিবারণ করা কষ্টকর- দুর্নিবার
যা পূর্বে ছিল এখন নেই- ভূতপূর্ব
যা বালকের মধ্যেই সুলভ- বালকসুলভ
যা বিনা য়ে লাভ করা গিয়েছে- অয়লন্ক
যা ঘূমিয়ে আছে- সুপ্ত
যা বার বার দুলছে- দোদুল্যমান
যা দীপ্তি পাচ্ছে- দেদীপ্যমান
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না- অনন্যসাধারণ
যা পূর্বে দেখা যায় নি- অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে জয় করা যায়- দুর্জয়
যা কষ্টে লাভ করা যায়- দুর্লভ
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত
যা অনেক কষ্টে অধ্যয়ন করা যায়- দুরধ্যয়
যা জলে চরে- জলচর
যা স্থলে চরে- স্থলচর
যা জলে ও স্থলে চরে- উভচর
যা বলা হয় নি- অনুক্ত
যা কথনো নষ্ট হয় না- অবিনশ্বর
যা মর্ম স্পর্শ করে- মর্মস্পর্শী
যা বলার যোগ্য নয়- অকথ্য
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না- অজ্ঞাতকুলশীল
যা চিন্তা করা যায় না- অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু- বন্ধুর
যা সম্পন্ন করতে বহু বায় হয়- ব্যয়বহুল
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়- নাতিশীতোষ্ণ
যার বিশেষ খ্যাতি আছে- বিখ্যাত
যা আঘাত পায় নি- অনাহত
যা উদিত হচ্ছে- উদীয়মান

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে- বর্ধিষ্ঠ
যা পূর্বে শোনা যায় নি- অশ্রুতপূর্ব
যা সহজে ভাঙ্গে- ভঙ্গুর
যা সহজে জীর্ণ হয়- সুপাচ
যা খাওয়ার যোগ্য- খাদ্য
যা চিবিয়ে/চর্বণ করে খেতে হয়- চর্ব
যা চুম্বে খেতে হয়- চোষ
যা লেহন করে খেতে হয়/লেহন করার যোগ্য- লেহ্য
যা পান করতে হয়/পান করার যোগ্য- পেয়
যা পানের অযোগ্য- অপেয়
যা বপন করা হয়েছে- উপ্ত
যা বলা হয়েছে- উক্ত
যার অন্য উপায় নেই- অনন্যোপায়
যার কোন উপায় নেই- নিরূপায়
যার উপস্থিতি বুদ্ধি আছে- প্রত্যুৎপন্নমতি
যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে- সর্বহারা, হতসর্বস্ব
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই- অকুতোভয়
যার আকার কুৎসিত- কদাকার
যার কোন শক্ত নেই/জন্মেনি- অজাতশক্ত
যার দাঢ়ি/শুশুর জন্মে নি- অজাতশুশুর
যার কিছু নেই- অকিঞ্চন
যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে- বীতস্পৃহ
যে শুনেই মনে রাখতে পারে- শ্রতিধর
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়- স্বয়ংবরা
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না- বনস্পতি
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে- হাতুড়ে
যে নারীর সন্তান বাঁচে না/যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে- মৃতবৎসা
যে গাছ অন্য কোন কাজে লাগে না- আগাছা
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে- পরগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেছে- কৃতদার
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি- অনূতা
যে ক্রমাগত রোদন করছে- রোকন্দ্যমান (স্ত্রীলিঙ্গ- রোকন্দ্যমানা)
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না- অপরিণামদশী
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে/অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করে কাজ করে যে- অবিমৃশ্যকারী
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক/বিসংবাদ নেই- অবিসংবাদী
যে বন হিংস্র জঙ্গতে পরিপূর্ণ- শ্বাপনদসংকুল
যিনি বক্তৃতা দানে পটু- বাঞ্চী
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়- সর্বসহা
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে- বীরপ্রসূ
যে নারীর কোন সন্তান হয় না- বন্ধা
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে- কাকবন্ধ্যা

যে নারীর স্বামী প্রবাসে আছে- প্রোষ্ঠিতভৃত্কা
 যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে আছে- প্রোষ্ঠিতপঞ্জীক
 যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর- সুদৰ্শন (স্ত্রীলিঙ্গ- সুদৰ্শনা)
 যে রব শুনে এসেছে- রবাহৃত
 যে লাফিয়ে চলে- প্লবগ
 যে নারী কখনো সূর্য দেখেনি- অসূর্যম্পশ্যা
 যে নারীর স্বামী মারা গেছে- বিধিবা
 যে নারীর সম্পত্তি বিয়ে হয়েছে- নবোঢ়া
 লাভ করার ইচ্ছা- লিঙ্গা
 শুভ ক্ষণে জন্ম যার- ক্ষণজন্মা
 শক্রকে/অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম
 শক্রকে বধ করে যে- শক্রব্ধ
 সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- প্রত্যুম্নমন
 সকলের জন্য প্রযোজ্য- সর্বজনীন
 সকলের জন্য হিতকর- সার্বজনীন
 স্ত্রীর বশীভূত হয় যে- স্ত্রৈণ
 সেবা করার ইচ্ছা- শুশৰ্ষা
 হনন/হত্যা করার ইচ্ছা- জিঘাংসা
 হরিণের চামড়া- অজিন
 হাতির ডাক- বৃংহতি

কিছু শুল্কপূর্ণ বাগধারা:

অ

বাগধারা	অর্থ	বাগধারা	অর্থ
অকাল কুঞ্চাণ	অপদার্থ, অকেজো	অষ্টরণ্ডা	ফাঁকি
অগাধ জলের মাছ	সুচুতুর ব্যক্তি	অকূল পাথার***	ভীষণ বিপদ
অর্ধচন্দ্র	গলা ধাক্কা	অন্ধকারে টিল মারা	আল্দাজে কাজ করা
অঙ্কের যষ্টি	একমাত্র অবলম্বন	অমৃতে অরংঢি	দামি জিনিসের প্রতি বিত্রুণ্ণা
অঙ্কের নড়ি	একমাত্র অবলম্বন	অগস্ত্য যাত্রা	চির দিনের জন্য প্রস্থান
অগ্নিশর্মা	নিরতিশয় ক্রুদ্ধ	অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	সামাজ্য বিদ্যার অহংকার
অগ্নিপরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা	অনধিকার চৰ্চা	সীমার বাইরে পদক্ষেপ
অগ্নিশর্মা	ক্ষিপ্ত	অরণ্যে রোদন	নিষ্কুল আবেদন
অগাধ জলের মাছ	খুব চালাক	অহি-নকুল সম্বন্ধ*	ভীষণ শক্রতা
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চাতুর্মের পরিণাম	অন্ধকার দেখা	দিশেহারা হয়ে পড়া
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	লোভে ক্ষতি	অমাবস্যার চাঁদ**	দুর্ভ বস্তু
অদৃষ্টের পরিহাস	বিধির বিড়ব্বনা, ভাগ্যের নির্ণূরতা	অনুরোধে টেঁকি গেলা	অনুরোধে দুর্কহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি দেয়া

*সমার্থক বাগধারা : দা-কুমড়া সম্পর্ক

**সমার্থক বাগধারা : ডুমুরের ফুল

***সমার্থক বাগধারা : সখাত সলিলে

আ

আকাশ কুসুম	অসম্ভব কল্পনা	আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া	দুর্ভ বস্তু প্রাপ্তি
আকাশ পাতাল	প্রভেদ, প্রচুর ব্যবধান	আদায় কাঁচকলায়	শত্রুতা
আকাশ থেকে পড়া	অপ্রত্যাশিত	আদা জল থেয়ে লাগা	প্রণপন চেষ্টা করা
আকাশের চাঁদ	আকাঙ্ক্ষিত বস্তু	আকেল গুড়ুম	হতবুদ্ধি, স্মষ্টিত
আঞ্চল নিয়ে খেলা	ভয়ঙ্কর বিপদ	আমড়া কাঠের টেকি	অপদার্থ
আঞ্চল ষি ঢালা	রাগ বাড়ানো	আকাশ ভেঙে পড়া	ভীষণ বিপদে পড়া
আঞ্চল ফুলে কলাগাছ	অপ্রত্যাশিত ধনলাভ	আমতা আমতা করা	ইতস্তত করা, দ্বিধা করা
আঠার আনা	সমুহ সম্ভাবনা	আটকপালে*	হতভাগ্য
আদায় কাঁচকলায়	তিক্ত সম্পর্ক	আঠার মাসের বছর	দীর্ঘসূত্রিতা
আঞ্চল আটখানা	খুব খুশি	আলালের ঘরের দুলাল	অতি আদরে নষ্ট পুত্র
আকেল সেলামি	নিরুদ্ধিতার দণ্ড	আকাশে তোলা	অতিরিক্ত প্রশংসা করা
আঞ্চল ফুলে কলাগাছ	হঠাত বড়লোক	আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি কেছা

সমার্থক বাগধারা : ইঁদুর কপালে

ই

ইঁদুর কপালে*	নিতান্ত মন্দভাগ্য	ইলশে গুঁড়ি	গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
ইঁচড়ে পাকা	অকালপক্ষ	ইতর বিশেষ	পার্থক্য

*সমার্থক বাগধারা : আটকপালে

উ

উত্তম মধ্যম	প্রহার	উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকারীর অধিকার
উড়নচন্দ্রী	অমিতব্যযী	উজানে কৈ	সহজলভ্য
উভয় সংকট*	দুই দিকেই বিপদ	উন্পাঁজুড়ে	অপদার্থ
উলু বনে মুক্ত ছড়ানো	অপাত্রে/অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান	উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো
উড়ো চিঠি	বেনামি পত্র	উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি

*সমার্থক বাগধারা : জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, শাঁথের করাত

এ

এক শ্বুরে মাথা মুড়ানো	একই স্বভাবের	একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়)
এক চোখা	পক্ষপাতিষ্ঠ, পক্ষপাতদুষ্ট	এক বনে দুই বাঘ	প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদ এক বারই আসে না, বার বার আসে	এক শ্বুরে মাথা মুড়ানো	একই দলভুক্ত
এলোপাতাড়ি	বিশৃঙ্খলা	এলাহি কাও	বিরাট আয়োজন
এসপার ওসপার	মীমাংসা		

ও

ওজন বুঝে চলা	অবস্থা বুঝে চলা	ওষুধে ধরা	প্রার্থিত ফল পাওয়া
--------------	-----------------	-----------	---------------------

ক

কচুকাটা করা	নির্মভাবে ধ্বংস করা	কেঁচো খুড়তে সাপ	বিপদজনক পরিস্থিতি
কচু পোড়া	অখাদ্য	কই মাছের প্রাণ*	যা সহজে মরে না
কচ্ছপের কামড়	যা সহজে ছাড়ে না	কুঁড়ের বাদশা	খুব অলস
কলম পেষা	কেরানিগিরি	কাক ভূষণী	দীর্ঘজীবী
কলুর বলদ	এক টানা খাটুনি	কেতা দুরস্ত	পরিপাটি
কথার কথা	গুরুত্বহীন কথা	কাছা আলগা	অসাবধান
কাঁঠালের আমসঁ	অসম্ভব বস্তু	কাঁচা পয়সা	নগদ উপার্জন
কপাল ফেরা	সৌভাগ্য লাভ	কাঁঠালের আমসঁ	অসম্ভব বস্তু
কাকতাল	আকস্মিক/দৈব যোগাযোগজাত ঘটনা	কূপমণ্ডুক	সীমাবদ্ধ জ্বাল সম্পন্ন, ঘরকুনো
কত ধানে কত চাল	হিসেব করে চলা	কাঠের পুতুল	নিজীব, অসার
কড়ায় গওয়া	পুরোপুরি	কথায় চিঁড়ে ভেজা	ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন
কান থাড়া করা	মনোযোগী হওয়া	কান পাতলা	সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ
কানকাটা	নির্লজ্জ	কাছা তিলা	অসাবধান
কান ভাঙানো	কুপরামশ দান	কুল কাঠের আগুন	তীব্র স্বালা
কান ভারি করা	কুপরামশ দান	কেঁচো খুড়তে সাপ	সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি
কাপড়ে বাবু	বাহ্যিক সাজ	কেউ কেটা	সামান্য
কেউ কেটা	গণ্যমান্য	কেঁচে গঙ্গুষ	পুনরায় আরম্ভ
কেঁচে গঙ্গুষ	পুনরায় আরম্ভ	কৈ মাছের প্রাণ	যা সহজে মরে না

*একই রকম বাগধারা : পুঁটি মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে যায়)

থ

থয়ের খাঁ*	চাটুকার	থও প্রলয়	ভীষণ ব্যাপার
থাল কেটে কুমির আনা	বিপদ ডেকে আনা		

*সমার্থক বাগধারা : ঢাকের কাঠি

গ

গড়লিকা প্রবাহ	অঙ্গ অনুকরণ	গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো	কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা
গদাই লক্ষণি চাল	অতি ধীর গতি, আলসেমি	গুরু মারা বিদ্যা	যার কাছে শিক্ষা তারই উপর প্রয়োগ
গণেশ উল্টানো	উর্থে যাওয়া, ফেল মারা	গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী লোক
গলগ্রহ	পরের বোঝা স্বরূপ থাকা	গোঁয়ার গোবিন্দ	নির্বোধ অথচ হঠকারী
গরিবের ঘোড়া রোগ	অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা	গোলায় যাওয়া	নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া
গরমা গরম	টাটকা	গোবর গণেশ	মুর্খ
গরজ বড় বালাই	প্রয়োজনে গুরুত্ব	গোলক ধাঁধা	দিশেহারা
গরু খেঁজা	তন্ত্র তন্ত্র করে খেঁজা	গোঁফ খেজুরে	নিতান্ত অলস

গরু মেরে জুতা দান	বড় ক্ষতি করে সামান্য ক্ষতিপূরণ	গোড়ায় গলদ	শুরুতে ভুল
গাছে কঁঠাল গোঁকে তেল	প্রাপ্তির আগেই আয়োজন	গৌরচন্দ্রিকা	ভূমিকা
গা ঢাকা দেওয়া	আত্মগোপন	গৌরীমেনের টাকা	বেহিসাবী অর্থ
গায়ে কাঁটা দেওয়া	রোমাঞ্চিত হওয়া	গুড়ে বালি	আশায় নৈরাশ্য
গাছে তুলে মই কাড়া	সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা		

ঘ

ঘোড়ার ডিম	অবাস্থা	ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধি
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ	ঘটিরাম	আনাড়ি হাকিম
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা	ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	নিজ খরচে পরের বেগার খাটা
ঘোড়ার ঘাস কাটা	অকাজে সময় নষ্ট করা	ঘর ভাঙানো	সংসার বিনষ্ট করা

চ

চুনকালি দেওয়া	কলঙ্ক	চক্ষুদান করা	চুরি করা
চশমখোর	চক্ষুলজ্জাহীন	চক্ষুলজ্জা	সংকোচ
চর্বিত চর্বণ	পুনরাবৃত্তি	চোখের বালি	চক্ষুশূল
চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য	চোখের পর্দা	লজ্জা
চিনির বলদ	ভারবাহী কিঞ্চ ফল লাভের অংশীদার নয়	চোখ কপালে তোলা	বিস্মিত হওয়া
চামচিকের লাখি	নগণ্য ব্যক্তির কটুত্তি	চোখ টাটানো	ঈর্ষা করা
চিনির পুতুল	শ্রমকাতর	চোখে ধূলো দেওয়া	প্রতারণা করা
চুঁনোপুটি	নগণ্য	চোখের চামড়া	লজ্জা
চুলোয় যাওয়া	ধ্বংস	চোখের মণি	প্রিয়

চিনে/ছিনে জোঁক (নাছোড়বাল্দা)

ছ

ছ কড়া ন কড়া	সম্মা দর	ছক্কা পাঞ্জা	বড় বড় কথা বলা
ছা পোষা	অত্যন্ত গরিব	ছিঁচ কাদুনে	অল্পই কাঁদে এমন
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা	সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি	ছিনিমিনি খেলা	নষ্ট করা
ছেলের হাতের মোয়া	সামান্য বস্তু	ছেলের হাতের মোয়া	সহজলভ্য বস্তু
ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা	নগণ্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন		

জ

জগাখিচুড়ি পাকানো	গোলমাল বাধানো	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ*	উভয় সঞ্চাট
জিলাপির প্যাঁচ	কুটিলতা		

*সমার্থক বাগধারা : উভয় সঞ্চাট, শাঁখের করাত

ঝ

ঝড়ো কাক	বিপর্যস্ত	ঝাঁকের কৈ	এক দলভুক্ত
ঝিকে মেরে বউকে বোঝানো	একজনের মাধ্যমে দিয়ে অন্যজনকে শিক্ষাদান	ঝোপ বুঝে কোপ মারা	সুযোগ মত কাজ করা

ট

টনক নড়া	চৈতন্যাদয় হওয়া	টেকে গোঁজা	আত্মসাং করা
টাকার কুমির	ধৰ্মী ব্যক্তি	টুপভুজঙ্গ	নেশায় বিভোর

ঢ

ঢাঁট বজায় রাখা	অভাব চাপা রাখা	ঢুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ
ঢেঁট কাটা	বেহায়া	ঢেলার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কাবু
ঢগ বাছতে গাঁ উজাড়	আদশহীনতার প্রাচুর্য		

ড

ডুমুরের ফুল	দুর্ভ বস্তু	ডান হাতের ব্যাপার*	খাওয়া
ডাকের সুন্দরী	খুবই সুন্দরী	ডামাডোল	গঙগোল
ডুমুরের ফুল**	দুর্ভ		

*একই রকম বাগধারা : বাঁ হাতের ব্যাপার- ঘূষ গ্রহণ

**সমার্থক বাগধারা : অমাবস্যার চাঁদ

চ

চাক চাক গুড় গুড়	গোপন রাখার চেষ্টা	টেকির কচকচি	বিরক্তিকর কথা
চাকের কাঠি*	মোসাহেব, চাটুকার	টি টি পড়া	কলঙ্ক প্রচার হওয়া
চাকের বাঁয়া	অপ্রয়োজনীয়	টিমে তেতালা	মন্ত্র

*সমার্থক বাগধারা : খয়ের থাঁ

ত

তালকানা	বেতাল হওয়া	তুলসী বনের বাঘ	ভও
তামের ঘর	ক্ষণস্থায়ী	তুলা ধূনা করা	দুর্দশাগ্রস্ত করা
তামার বিষ	অর্থের কু প্রভাব	তুষের আগুন	দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী	তীর্থের কাক*	প্রতীক্ষারত
তিলকে তাল করা	বাড়িয়ে বলা		

*একই রকম বাগধারা : ভূশণির কাক- দীর্ঘজীবী

থ

থ বনে যাওয়া	স্তুষ্টি হওয়া	থরহরি কম্প	ভীতির আতিশয়ে কাঁপা
--------------	----------------	------------	---------------------

দ

দা-কুমড়া*	ভীষণ শক্রতা	দেঁতো হাসি	কৃতিম হাসি
দহরম মহরম	ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক	দাদ নেওয়া	প্রতিশোধ নেয়া
দুধে ভাতে থাকা	থেয়ে-পড়ে সুখে থাকা	দুকান কাটা	বেহায়া
দিনকে রাত করা	সত্যকে মিথ্যা করা	দুধের মাছি	সু সময়ের বন্ধু
দু মুখো সাপ	দু জনকে দু রকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শক্রতা সৃষ্টিকারী		

*সমার্থক বাগধারা : অহি-নকুল সম্বন্ধ

ধ

ধরাকে সরা জ্ঞান করা	সকলকে তুচ্ছ ভাবা	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	সত্য গোপন থাকে না
ধড়া-চূড়া	মাজপোশাক	ধর্মের ষাঁড়	যথেষ্টচারী
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	অহঙ্কারে সবকিছু তুচ্ছ মনে করা	ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কৌশলে কার্যান্বান

ন

ননীর পুতুল	শ্রমবিমুখ	নামকাটা সেপাই*	কর্মচৃত ব্যক্তি
নয় ছয়	অপচয়	নথ নাড়া	গর্ব করা
নাটের ওক	মূল নায়ক	নেই আঁকড়া	একগুঁয়ে
নাড়ি নক্ষত্র	সব তথ্য	নগদ নারায়ণ	কাঁচা টাকা/ নগদ অর্থ
নিমক হারাম	অকৃতজ্ঞ	নেপোয় মারে দই	ধূর্ত লোকের ফল প্রাপ্তি
নিমরাজি	প্রায় রাজি		

*একই রকম বাগধারা : তালপাতার সেপাই- শ্রীণজীবী

প

পটল তোলা	মারা যাওয়া	পুঁটি মাছের প্রাণ*	যা সহজে মরে যায়
পগার পার	আয়তের বাইরে পালিয়ে যাওয়া	পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা	বড় রকমের চুরি
পটের বিবি	সুসংজ্ঞিত	পুরুর চুরি	পুরোনো প্রসঙ্গে কটাক্ষ করা
পত্রপার্থ	অবিলম্বে/সঙ্গে সঙ্গে	পোঁ ধরা	অন্যকে দেখে একই কাজ করা
পালের গোদা	দলপতি	পোয়া বারো	অতিরিক্ত সৌভাগ্য
পাকা ধানে মই	অনিষ্ট করা	প্রমাদ গোণা	ভীত হওয়া
পাথিপড়া করা	বার বার শেখানো	পায়াভারি	অহঙ্কার
পাততাড়ি গুটানো	জিনিসপত্র গোটানো	পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অপরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার
পাথরে পাঁচ কিল	সৌভাগ্য	পরের ধনে পোদ্দারি	অন্যের অর্থের যথেচ্ছ ব্যয়

*একই রকম বাগধারা : কৈ মাছের প্রাণ- যা সহজে মরে না

ফ

ফপর দালালি	অতিরিক্ত চালবাজি	ফুলের ঘাঁয়ে মুর্ছা যাওয়া	অল্পে কাতর
ফুলবাবু	বিলাসী	ফোড়ন দেওয়া	টিপ্পনী কাটা
ফেউ লাগা	আর্ঠার মতো লেগে থাকা		

ব

বক ধার্মিক	ভও সাধু	বাজখাঁই গলা	অত্যন্ত কর্কশ ও উঁচু গলা
বইয়ের পোকা	খুব পড়ুয়া	বাড়া ভাতে ছাই	অনিষ্ট করা
বগল বাজানো	আনন্দ প্রকাশ করা	বায়াতরে ধরা	বার্ধক্যের কারণে কাওজ্জানহীন
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো	সহজে খুলে যায় এমন	বিদ্যার জাহাজ	অতিশয় পণ্ডিত
বসন্তের কোকিল	সুদিনের বন্ধু	বিশ বাঁও জলে	সাফল্যের অতীত
বিড়াল তপস্বী	ভও সাধু	বিনা মেঘে বজ্রপাত	আকস্মিক বিপদ
বর্ণচোরা আম	কপট ব্যক্তি	বাধের দুধ	দুঃসাধ্য বস্তু
বরাক্ষরে	অলঙ্কুরে	বাধের চোখ	দুঃসাধ্য বস্তু
বাজারে কাটা	বিক্রি হওয়া	বিসমিল্লায় গলদ	শুরুতেই ভুল
বালির বাঁধ	অস্থায়ী বস্তু	বুদ্ধির টেক্কি	নিরেট মূর্খ
বাঁ হাতের ব্যাপার*	ঘূষ গ্রহণ	ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
বাঁধা গৎ	নির্দিষ্ট আচরণ	ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা

*একই রকম বাগধারা : ডান হাতের ব্যাপার- খাওয়া

ভ

ভৰাডুবি	সৰ্বনাশ	ভাঁড়ে ভবানী	নিঃস্ব অবস্থা
ভঙ্গে ঘি ঢালা	নিষ্ফল কাজ	ভুতের ব্যাগার	অযথা শ্রম
ভাদ্র মাসের তিল	প্রচণ্ড কিল	ভুঁই ফোড়	হঠাতে গজিয়ে ওঠা
ভানুমতীর খেল	অবিশ্বাস্য ব্যাপার	ভিজে বিড়াল	কপটাচারী
ভালুকের জ্বর	ফ্রণস্থায়ী জ্বর	ভুশান্ডির কাক*	দীর্ঘজীবী

*একই রকম বাগধারা : তীর্থের কাক- প্রতীক্ষারাত

ম

মগের মূলুক	অরাজক দেশ	মুখে দুধের গন্ধ	অতি কম বয়স
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন	মুক্তিল আসান	নিষ্ঠুতি
মন না মতি	অস্থির মানব মন	মেনি মুখো	লাজুক
মড়াকান্না	উষ্টকর্ণে শোক প্রকাশ	মাকাল ফল	অন্তঃসারশূণ্য
মাছের মায়ের পুত্রশোক	কপট বেদনাবোধ	মিছরিন ছুরি	মুখে মধু অন্তরে বিষ
মশা মারতে কামান দাগা	সামান্য কাজে বিরাট	মুখে ফুল চন্দন পড়া	শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ
মুখ চুল হওয়া	লজ্জায় ল্লান হওয়া	মেছো হাটা	তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত

য

যক্ষের ধন	কৃপণের ধন	যমের অরুচি	যে সহজে মরে না
-----------	-----------	------------	----------------

র

রঞ্জপ্রসবিনী	সুযোগ সন্তানের মা	রাবণের গুষ্ঠি	বড় পরিবার
রাঘব বোয়াল	সৰ্বগ্রাসী ক্ষমতাবান ব্যক্তি	রায় বাঘিনী	উগ্র স্বভাবের নারী
রাবণের চিতা	চির অশান্তি	রাজ যোটক	উপযুক্ত মিলন
রাশভারি	গন্তীর প্রকৃতির	রাহুর দশা	দুঃসময়
রাই কুড়িয়ে বেল	ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ	রঞ্জ-কাতলা	পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি
রাজা উজির মারা	আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প		

ল

লগন চাঁদ	ভাগ্যবান	লাল বাতি আলা	দেউলিয়া হওয়া
ললাটের লিখন	অমোঘ ভাগ্য	লাল হয়ে যাওয়া	ধনশালী হওয়া
লাল পানি	মদ	লেজে গোবরে	বিশৃঙ্খলা
লেফাফা দুরস্ত	বাইরের ঠাট বজার রেখে চলেন যিনি		

শ

শকুনি মামা	কুটিল ব্যক্তি	শিরে সংক্রান্তি	বিপদ মাথার ওপর
শাঁখের করাত*	দুই দিকেই বিপদ	শয়ে শয়ে লেজ নাড়া	আলসে সময় নষ্ট করা
শাপে বর	অনিষ্টে ইষ্ট লাভ	শরতের শিশির	সুসময়ের বন্ধু
শিকায় ওঠা	স্থগিত	শক্র মুখে ছাই	কুদৃষ্টি এড়ানো
শিঙে ফেঁকা	মরা	শ্রীঘৰ	কারাগার
শিবরাত্রির সলতে	একমাত্র সন্তান		

*সমার্থক বাগধারা : উভয় সঙ্কট, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

ষ

ষেল কলা	পুরোপুরি	ষাঁড়ের গোবর	অযোগ্য
ষেল আনা			

স

সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্যসুফল মিলে	সাতেও নয়, পাঁচেও নয়	নির্নিষ্ঠ
সরফরাজি করা	অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি	সাপের পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারী হওয়া
সাত খুন মাফ	অত্যধিক প্রশ্রয়	সোনায় সোহাগা	উপযুক্ত মিলন
সাত সতের	নানা রকমের	সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
সাপের ছুঁচে গেলা	অনিষ্ট্য বাধ্য হয়ে কাজ করা	সখাত সলিলে*	ঘোর বিপদে পড়া
সেয়ানে সেয়ানে	চালাকে চালাকে	সব শেয়ালের এক রা	গ্রিকমত্য
সবে ধন গীলমণি	একমাত্র অবলম্বন		

*সমার্থক বাগধারা : অকূল পাথারে

হ

হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা প্রকাশ করা	হাতের পাঁচ	শেষ সম্বল
হাতটান	চুরির অভ্যাস	হীরার ধার	অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি
হ য ব র ল	বিশৃঙ্খলা	হোমরা চেমরা	গণ্যমান্য ব্যক্তি
হাতুড়ে বদ্বি	আনাড়ি চিকিৎসক	হিতে বিপরীত	উল্টো ফল
হরিলুট	অপচয়	হাড় হদ	নাড়ি নষ্ক্রি/সব তথ্য
হস্তীমূর্খ	বুদ্ধিতে স্থূল	হালে পানি পাওয়া	সুবিধা করা
হাড়ে দুর্বা গজানো	অত্যন্ত অলস হওয়া	হাড় হাভাতে	মন্দভাগ্য
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ		

প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের কিছু বিশেষ কৌশল আছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- সমাস, সংক্ষি, উপসর্গ যোগে ও প্রত্যয় সংধিত হয়ে শব্দ গঠন।

প্রাতিপদিক : বিভক্তিহীন নামশব্দকে প্রাতিপদিক বলে/নামপদের যেই অংশকে আর বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, তাকেই প্রাতিপদিক বলে।

যেমন- ‘হাত’। এর সঙ্গে বিভক্তি নেই। এর সঙ্গে ‘আ’ যুক্ত করে নতুন শব্দ ‘হাতা’ তৈরি করা যেতে পারে। এটিও একটি নাম শব্দ। আবার এর সঙ্গে ‘অল’ শব্দাংশ যুক্ত করে ‘হাতল’ নামশব্দটি তৈরি করা যেতে পারে।

ক্রিয়ামূল বা ধাতু : ক্রিয়াপদের মূলশব্দকে বলা হয় ক্রিয়ামূল বা ধাতু। যেমন- ‘পড়’। এটি নিজেই একটি ক্রিয়াপদ (বর্তমান কালের অনুভূত্য তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ)। আবার এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে কাল ও পুরুষভেদে ক্রিয়াটির রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- পড়ো, পড়ুন, পড়বে, পড়ছি, পড়ছিলাম, পড়েছি, ইত্যাদি।

বাংলা ব্যাকরণে ধাতু চিহ্নিত করার জন্য একটি আলাদা ব্যাকরণিক চিহ্ন (✓) ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় ধাতু চিহ্ন। অর্থাৎ √পড় মানে ‘পড়’ ধাতু।

প্রকৃতি : শব্দমূল বা শব্দের যে অংশকে আর ভাঙা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। **প্রত্যয় যুক্ত প্রতিটি মৌলিক শব্দ তথা প্রত্যয় যুক্ত প্রতিটি প্রাতিপদিক ও ধাতুই একেকটি প্রকৃতি।** কিন্তু মৌলিক শব্দকে প্রকৃতি বলা যায় না। যখনই সেই শব্দের সঙ্গে বা অতিরিক্ত শব্দাংশ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তখনই কেবল নতুন সৃষ্টি শব্দটির মূল শব্দটিকে প্রকৃতি বলা যায়।

অর্থাৎ, প্রত্যয় সাধিত শব্দের মূলশব্দকে বলা হয় প্রকৃতি। কিন্তু শব্দটি থেকে প্রত্যয় সরিয়ে ফেললে, মূলশব্দটিকে তখন আর প্রকৃতি বলা যাবে না।

যেমন- লাজুক, বড়াই, ঘরামি, পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা শব্দগুলোর মূলশব্দ যথাক্রমে লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, জিত। এখানে, লাজুক, বড়াই, ঘরামি, পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা শব্দগুলো প্রত্যয়সাধিত (মূলশব্দের সঙ্গে অতিরিক্ত শব্দাংশ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।) আর এই শব্দগুলোর মূলশব্দ লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, জিত। অর্থাৎ লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, জিত- এগুলো লাজুক, বড়াই, ঘরামি, পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা শব্দগুলোর প্রকৃতি। কিন্তু আলাদাভাবে উল্লেখ করলে এগুলো আর প্রকৃতি নয়, এগুলো তখন স্বেচ্ছ কতোগুলো মৌলিক শব্দ।

প্রত্যয় : মূলশব্দ বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে যে অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নামপদ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। অর্থাৎ, প্রাতিপদিক ও ধাতুর সঙ্গে যেই শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদেরকেই প্রত্যয় বলে। উপরের উদাহরণে, লাজুক শব্দের প্রকৃতি ‘লাজ’-এর সঙ্গে প্রত্যয় ‘উক’ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে ‘লাজুক’ শব্দটি। এমনিভাবে

প্রকৃতি + প্রত্যয় = প্রত্যয়সাধিত শব্দ

বড় + আই = বড়াই

ঘর + আমি = ঘরামি

প্রকৃতি ২ প্রকার:

নাম প্রকৃতি : প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকটিকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন, উপরের লাজ, ঘর- এগুলো নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুটিকে ক্রিয়া প্রকৃতি বলে। যেমন, উপরের √পড়, √নাচ, এগুলো ক্রিয়া প্রকৃতি।

প্রত্যয় ২ প্রকার-

কৃৎ প্রত্যয় : ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যেই প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে, ‘√পড়’-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ‘উয়া’, ‘√নাচ’-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ‘উনে’ কৃৎ প্রত্যয়।

তদ্বিতীয় প্রত্যয় : নাম প্রকৃতির সঙ্গে যেই প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে তদ্বিতীয় প্রত্যয় বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে, ‘লাজ’-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ‘উক’, ‘ঘর’-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ‘আমি’ তদ্বিতীয় প্রত্যয়।

কৃদন্ত পদ : কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। অর্থাৎ যে নাম পদ (বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ) ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যোগ হয়ে গঠিত, তাকে কৃদন্ত পদ বলে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে গঠিত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদকেই কৃদন্ত পদ বলে। যেমন, উপরের পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা।

তদ্বিতীয় পদ : তদ্বিতীয় প্রত্যয় সাধিত শব্দকে তদ্বিতীয় পদ বলে। যেমন, উপরের লাজুক, বড়াই, ঘরামি।

অনেক সময় কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতুর আদিস্বর অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন যথেষ্টভাবে হয় না, কিছু নিয়ম অনুসরণ করে হয়। কৃৎ প্রত্যয় ব্যবহৃত হওয়ার সময় পরিবর্তন হওয়ার নিয়ম ২টি- গুণ ও বৃদ্ধি।

গুণ :

ই/ঈ-স্বলে এ	$\sqrt{\text{চি}+\text{আ}} = \text{চেনা}$, $\sqrt{\text{নী}+\text{আ}} = \text{নেওয়া}$
উ/উ-স্বলে ও	$\sqrt{\text{ধু}+\text{আ}} = \text{ধোয়া}$
খ-স্বলে অর	$\sqrt{\text{কৃ}+\text{তা}} = \text{করতা} > \text{ক্রেতা}$

বৃদ্ধি:

অ-স্বলে আ	$\sqrt{\text{পচ}+\text{ণক(অক)}} = \text{পাচক}$
ই/ঈ-স্বলে ঐ	$\sqrt{\text{শিশু}+\text{ঞ্চ}} = \text{শৈশব}$
উ/উ-স্বলে ও	$\sqrt{\text{যুব}+\text{অন}} = \text{যৌবন}$
খ-স্বলে আর	$\sqrt{\text{কৃ}+\text{ঘণ(য-ফলা)}} = \text{কার্য}$

ইঁ : প্রত্যয় প্রাতিপদিক বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় প্রায়ই সম্পূর্ণ বা অথও অবস্থায় যুক্ত হয় না; এর কিছু অংশ লোপ পায়। যুক্ত হওয়ার সময় প্রত্যয়ের কিছু অংশ লোপ পাওয়াকে বলা হয় ইঁ।

সাধারণত বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সময় ইঁ হয় না বা লোপ পায় না। অন্যদিকে অধিকাংশ সংস্কৃত প্রত্যয়-ই ইঁ হয়ে বা আংশিক লোপ পেয়ে যুক্ত হয় বা ব্যবহৃত হয়। উচ্চারণ বা ব্যবহার সহজ করার জন্যই এই লোপ পাওয়ার ঘটনা বা ইঁ ঘটে। শব্দের মতো সংস্কৃত প্রত্যয়ও বাংলা ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আর এই পরিবর্তনের জন্য সংস্কৃত প্রত্যয়ের লোপ পাওয়া-ই ইঁ।

যেমন, $\sqrt{\text{স্থা}}+\text{অনট} = \sqrt{\text{স্থা}}+\text{অন(ট ইঁ বা লোপ)} = \text{স্থান}$

কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয় ২ প্রকার- বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
শূণ্য প্রত্যয় (প্রত্যয় ছাড়া কোনো ক্রিয়া প্রকৃতি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হলে সেখানে শূণ্য প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে বলে ধরা হয়।)	জিত্ হার্ ধৰপাকড় (ধৰ ও পাকড় একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে)	
অ	$\sqrt{\text{ধর}+\text{অ}} = \text{ধৰ}$ $\sqrt{\text{মার}+\text{অ}} = \text{মার}$ বিঃদ্রঃ আধুনিক বাংলায় সর্বত্র অ-প্রত্যয় উচ্চারিত হয় না। যেমন- $\sqrt{\text{হার}+\text{অ}} = \text{হাৰ}$	দ্বিত্ব প্রয়োগ (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে) : $\sqrt{\text{কাঁদ}+\text{অ}} = \text{কাঁদকাঁদ}$ $\sqrt{\text{মৰ}+\text{অ}} = \text{মৰমৰ}$
অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{কাঁদ}+\text{অন}} = \text{কাঁদন}$ $\sqrt{\text{নাচ}+\text{অন}} = \text{নাচন}$ $\sqrt{\text{বাড়}+\text{অন}} = \text{বাড়ন}$ $\sqrt{\text{বুল}+\text{অন}} = \text{বুলন}$ $\sqrt{\text{দুল}+\text{অন}} = \text{দোলন}$	ধাতুর শেষে ‘আ-কার’ থাকলে ‘ওন’ হয়। যেমন- $\sqrt{\text{থা}+\text{অন}} = \text{থাওন}$ $\sqrt{\text{ছা}+\text{অন}} = \text{ছাওন}$

		√দে+অন = দেওন
অনা	√দুল+অনা = দোলনা √খেল+অনা = খেলনা	
অনি/উনি	√চির+অনি = চিরনি > চিরনি √বাঁধ+অনি = বাঁধুনি √আঁট+অনি = আঁটুনি	
অন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√উড়+অন্ত = উড়ন্ত √ডুব+অন্ত = ডুবন্ত	
অক	√মুড়+অক = মোড়ক √ঝল+অক = ঝলক	
আ	√পড়+আ = পড়া √রাঁধ+আ = রাঁধা √কেন+আ = কেনা? √কাচ+আ = কাচ √ফুট+আ = ফোটা?	
আই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√চড়+আই = চড়াই √সিল+আই = সিলাই	
আও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√পাকড়+আও = পাকড়াও √চ+আও = চড়াও	
আন(আনো) (প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)	√জানা+আন = জানানো √শোনা+আন = শোনানো √ভাসা+আন = ভাসানো √চাল+আন = চালানো/চালান √মান+আন = মানান/মানানো	
আনি	√জান+আনি = জানানি √শুন+আনি = শুনানি √উড়+আনি = উড়ানি (√উড়+উনি = উড়ুনি)	
আরি/আরী/রি/উরি	√ডুব+আরি/উরি = ডুবুরি √ধূন+আরী = ধূনারী √পূজা+আরী = পূজারী	
আল	√মাত+আল = মাতাল √মিশ+আল = মিশাল	
ই	√ভাজ+ই = ভাজি √বেড়+ই = বেড়ি	
ইয়া/ইয়ে	√মর+ইয়া = মরিয়া √বল+ইয়ে = বলিয়ে √নাচ+ইয়ে = নাচিয়ে √গা+ইয়ে = গাহিয়ে √লিথ+ইয়ে = লিথিয়ে √বাজ+ইয়ে = বাজিয়ে	

উ	$\sqrt{k}+ইয়ে$ = কইয়ে $\sqrt{ডাক}+উ$ = ডাকু $\sqrt{ঝাড়}+উ$ = ঝাড়ু	বিহুপ্রয়োগ : $\sqrt{উড়}+উ$ = উড়ুউড়ু
উয়া/ও	$\sqrt{পড়}+উয়া$ = পড়ুয়া $\sqrt{উড়}+উয়া$ = উড়ুয়া > উড়ো/ $\sqrt{উড়}+ও$ = উড়ো	
তা (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{ফির}+তা$ = ফিরতা > ফেরতা $\sqrt{পড়}+তা$ = পড়তা $\sqrt{বহ}+তা$ = বহতা	
তি (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{ঘাট}+তি$ = ঘাটতি $\sqrt{বাড়}+তি$ = বাড়তি $\sqrt{কাট}+তি$ = কাটতি $\sqrt{উঠ}+তি$ = উঠতি	
না (বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{কাঁদ}+না$ = কাঁদনা > কান্না $\sqrt{রাঁধ}+না$ = রাঁধনা > রান্না $\sqrt{ঝর}+না$ = ঝরনা	

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রত্যয়			শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
মূল	ইং/লো প	থাকে		
অনট	ট	অন	$\sqrt{নী}+অনট$ > নে+অন* = নয়ন $\sqrt{শ্চ}+অনট$ = শ্বরণ* $\sqrt{স্থ}+অনট$ = স্থান $\sqrt{ভোজ}+অনট$ = ভোজন $\sqrt{নৃত}+অন$ = নৃতন* $\sqrt{দৃশ}+অন$ = দর্শন* $\sqrt{নল্দি}+অনট$ = নল্দন	
ক্ত	ক	ত	$\sqrt{জ্ঞা}+ক্ত$ = জ্ঞাত $\sqrt{থ্যা}+ক্ত$ = থ্যাত	ক) কিছু কিছু ধাতুর শেষে ‘ই-কার’ যুক্ত হয়। যেমন- $\sqrt{পঠ}+ক্ত$ = পঠিত $\sqrt{লিখ}+ক্ত$ = লিখিত $\sqrt{বিদ}+ক্ত$ = বিদিত $\sqrt{বেষ্ট}+ক্ত$ = বেষ্টিত $\sqrt{চল}+ক্ত$ = চলিত $\sqrt{পত}+ক্ত$ = পতিত $\sqrt{লুণ্ঠ}+ক্ত$ = লুণ্ঠিত $\sqrt{স্ফুর}+ক্ত$ = স্ফুরিত $\sqrt{শিক্ষ}+ক্ত$ = শিক্ষিত খ) ধাতুর শেষে ‘চ/জ’ থাকলে তা ‘ক’ হয়।

				<p>যেমন-</p> <p>$\sqrt{\text{মুচ}+\text{ক্ত}}$ = মুক্ত $\sqrt{\text{ভুজ}+\text{ক্ত}}$ = ভুক্ত</p> <p>গ) নিপাতনে সিদ্ধ :</p> <p>$\sqrt{\text{গম}+\text{ক্ত}}$ = গত $\sqrt{\text{গ্রহ}+\text{ক্ত}}$ = গ্রাথিত $\sqrt{\text{চুর}+\text{ক্ত}}$ = চূণ $\sqrt{\text{ছিদ}+\text{ক্ত}}$ = ছিল্ল $\sqrt{\text{জন}+\text{ক্ত}}$ = জাত $\sqrt{\text{হন}+\text{ক্ত}}$ = হত $\sqrt{\text{দা}+\text{ক্ত}}$ = দও $\sqrt{\text{দহ}+\text{ক্ত}}$ = দঘ $\sqrt{\text{মুহ}+\text{ক্ত}}$ = মুঘ $\sqrt{\text{যুধ}+\text{ক্ত}}$ = যুঘ $\sqrt{\text{লভ}+\text{ক্ত}}$ = লঘ $\sqrt{\text{বচ}+\text{ক্ত}}$ = উক্ত $\sqrt{\text{বপ}+\text{ক্ত}}$ = উপ্ত $\sqrt{\text{স্বপ}+\text{ক্ত}}$ = সুপ্ত $\sqrt{\text{সূজ}+\text{ক্ত}}$ = সৃষ্ট</p>
ক্তি	ক	তি	$\sqrt{\text{গম}+\text{ক্তি}}$ = গতি	<p>ক) কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়।</p> <p>যেমন-</p> <p>$\sqrt{\text{মন}+\text{ক্তি}}$ = মতি $\sqrt{\text{রম}+\text{ক্তি}}$ = রতি</p> <p>থ) কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ-কার যুক্ত হয়। যেমন-</p> <p>$\sqrt{\text{শ্রম}+\text{ক্তি}}$ = শ্রান্তি $\sqrt{\text{শম}+\text{ক্তি}}$ = শান্তি</p> <p>গ) ধাতুর শেষে ‘চ/জ’ থাকলে তা ‘ক’ হয়।</p> <p>যেমন-</p> <p>$\sqrt{\text{বচ}+\text{ক্তি}}$ = উক্তি $\sqrt{\text{মুচ}+\text{ক্তি}}$ = মুক্তি $\sqrt{\text{ভজ}+\text{ক্তি}}$ = ভক্তি</p> <p>ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ :</p> <p>$\sqrt{\text{বচ}+\text{ক্তি}}$ = উক্তি $\sqrt{\text{গৈ}+\text{ক্তি}}$ = গীতি $\sqrt{\text{সিধ}+\text{ক্তি}}$ = সিদ্ধি $\sqrt{\text{বুধ}+\text{ক্তি}}$ = বুদ্ধি $\sqrt{\text{শক}+\text{ক্তি}}$ = শক্তি</p>
তব্য			$\sqrt{\text{কু}+\text{তব্য}}$ = কর্তব্য* $\sqrt{\text{দা}+\text{তব্য}}$ = দাতব্য $\sqrt{\text{পর্য}+\text{তব্য}}$ = পর্যটব্য	

অনীয়			$\sqrt{\text{ক}}+\text{অনীয়} = \text{করনীয়}*$ $\sqrt{\text{রঞ্জ}}+\text{অনীয়} = \text{রঞ্জনীয়}$ $\sqrt{\text{দৃশ}}+\text{অনীয়} = \text{দশনীয়}*$ $\sqrt{\text{পান}}+\text{অনীয়} = \text{পানীয়}$ $\sqrt{\text{শ্রু}}+\text{অনীয়} = \text{শ্রবনীয়}$ $\sqrt{\text{পালন}}+\text{অনীয়} = \text{পালনীয়}$	
ত্রচ	চ	ত্র	$\sqrt{\text{দা}}+\text{ত্রচ} = \text{দাতা}$ $\sqrt{\text{মা}}+\text{ত্রচ} = \text{মাতা}$ $\sqrt{\text{ক্রী}}+\text{ত্রচ} = \text{ক্রেতা}$	$\sqrt{\text{যুধ}}+\text{ত্রচ} = \text{যোদ্ধা}$
ণক	ণ	অক	$\sqrt{\text{পর্থ}}+\text{ণক} = \text{পার্থক}^{\circ}$ $\sqrt{\text{গী}}+\text{ণক} > \sqrt{\text{নৈ}}+\text{অক} = \text{নায়ক}^{\circ}$ $\sqrt{\text{গৈ}}+\text{ণক} = \text{গায়ক}$ $\sqrt{\text{লিথ}}+\text{ণক} = \text{লেখক}^*$	<p>ক) প্রযোজক ধাতুর শেষে ‘ই-কার’ থাকলে লোপ পায়-</p> <p>$\sqrt{\text{পুঁজি}}+\text{ণক} = \text{পুজক}$ $\sqrt{\text{জনি}}+\text{ণক} = \text{জনক}$ $\sqrt{\text{চালি}}+\text{ণক} = \text{চালক}$ $\sqrt{\text{স্ত্রাবি}}+\text{ণক} = \text{স্ত্রাবক}$</p> <p>খ) ধাতুর শেষে ‘আ-কার’ থাকলে অতিরিক্ত ‘য়’ যুক্ত হয়। যেমন-</p> <p>$\sqrt{\text{দা}}+\text{ণক} = \text{দায়ক}$ $\text{বি}+\sqrt{\text{ধা}}+\text{ণক} = \text{বিধায়ক}$</p>
ঘ্যণ	ঘ, ণ	ঘ- ফলা	$\sqrt{\text{ক}}+\text{ঘ্যণ} = \text{কার্য} > \text{কার্য}$ $\sqrt{\text{ধূ}}+\text{ঘ্যণ} = \text{ধার্য}$ $\sqrt{\text{বাচ}}+\text{ঘ্যণ} = \text{বাচ্য}$ $\sqrt{\text{ভোজ}}+\text{ঘ্যণ} = \text{ভোজ্য}$ $\sqrt{\text{যোগ}}+\text{ঘ্যণ} = \text{যোগ্য}$ $\sqrt{\text{হাস}}+\text{ঘ্যণ} = \text{হাস্য}$ $\text{পরি}+\sqrt{\text{হার}}+\text{ঘ্যণ} = \text{পরিহার্য}$	
ঘ		ঘ > য	$\sqrt{\text{দা}}+\text{ঘ} > \sqrt{\text{দে}}+\text{ঘ} = \text{দেয়}$ $\sqrt{\text{হা}}+\text{ঘ} > \sqrt{\text{হে}}+\text{ঘ} = \text{হেয়}$ $\text{বি}+\sqrt{\text{ধা}}+\text{ঘ} = \text{বিধেয়}$ $\text{অ}+\sqrt{\text{জি}}+\text{ঘ} = \text{অজেয়}$ $\text{পরি}+\sqrt{\text{মা}}+\text{ঘ} = \text{পরিমেয়}$ $\text{অনু}+\sqrt{\text{মা}}+\text{ঘ} = \text{অনুমেয়}$	<p>ক) শেষে ব্যঞ্জন থাকলে ঘ-ফলা হয়। যেমন-</p> <p>$\sqrt{\text{গম}}+\text{ঘ} = \text{গম্য}$ $\sqrt{\text{লভ}}+\text{ঘ} = \text{লভ্য}$</p>
ণিন	ণ	ইন>ন্টি -কার	$\sqrt{\text{গহ}}+\text{ণিন} = \text{গাহী}$ $\sqrt{\text{পা}}+\text{ণিন} = \text{পায়ী}$ $\sqrt{\text{ক}}+\text{ণিন} = \text{কারী}$ $\sqrt{\text{দ্রোহ}}+\text{ণিন} = \text{দ্রোহী}$ $\text{সত্য}+\sqrt{\text{বাদ}}+\text{ণিন} = \text{সত্যবাদী}$ $\sqrt{\text{ভাব}}+\text{ণিন} = \text{ভাবী}$ $\sqrt{\text{স্থা}}+\text{ণিন} = \text{স্থায়ী}$	<p>‘হন’ ধাতুর ক্ষেত্রে-</p> <p>$\sqrt{\text{হন}}+\text{ণিন} = \text{ঘাতী} :$ $\text{আঘা}+\sqrt{\text{হন}}+\text{ণিন} = \text{আঘাঘাতী}$</p>

			$\sqrt{\text{গ}}\text{ম}+\text{ণিন} = \text{গামী}$	
ইন		ইন>সৈ -কার	$\sqrt{\text{শ}}\text{ম}+\text{ইন} = \text{শ্রমী}$	
অল	ল	অ	$\sqrt{\text{জ}}\text{ি}+\text{অল} = \text{জয়}$ $\sqrt{\text{ক্ষ}}\text{ি}+\text{অল} = \text{ক্ষয়}$ $\sqrt{\text{নিচ}}\text{ি}+\text{অল} = \text{নিচয়}$ $\sqrt{\text{বিন}}\text{ি}+\text{অল} = \text{বিনয়}$ $\sqrt{\text{বিল}}\text{ি}+\text{অল} = \text{বিলয়}$	$\sqrt{\text{হ}}\text{ন}+\text{অল} = \text{বধ}$
ইষ্টু			$\sqrt{\text{চল}}\text{ি}+\text{ইষ্টু} = \text{চলিষ্টু}$ $\sqrt{\text{ক্ষয়}}\text{ি}+\text{ইষ্টু} = \text{ক্ষয়িষ্টু}$ $\sqrt{\text{বর্ধ}}\text{ি}+\text{ইষ্টু} = \text{বর্ধিষ্টু}$	
বৱ			$\sqrt{\text{টৈশ}}\text{ি}+\text{বৱ} = \text{টৈশ্বর}$ $\sqrt{\text{ভাস}}\text{ি}+\text{বৱ} = \text{ভাস্বর}$ $\sqrt{\text{নশ}}\text{ি}+\text{বৱ} = \text{নশ্বর}$ $\sqrt{\text{স্থা}}\text{ি}+\text{বৱ} = \text{স্থাবর}$	
ৱ			$\sqrt{\text{হিন}}\text{ি}+\text{স}+\text{ৱ} = \text{হিংস্ব}$ $\sqrt{\text{নম}}\text{ি}+\text{ৱ} = \text{নম্ব}$	
উক/উক			$\sqrt{\text{ভু}}\text{ু}+\text{উক} > \text{ভো}+\text{উক} = \text{ভাবুক}$ $\sqrt{\text{জাগ}}\text{ি}+\text{উক} = \text{জাগকুক}$	
শানচ	শ, চ	আন/ মান	$\sqrt{\text{দীপ}}\text{ি}+\text{শানচ} = \text{দীপ্যমান}$ $\sqrt{\text{চল}}\text{ি}+\text{শানচ} = \text{চলমান}$ $\sqrt{\text{বৰ্ধ}}\text{ি}+\text{শানচ} = \text{বৰ্ধমান}$	
ঘঞ্চ	ঘ, ঞ্চ	অ	$\sqrt{\text{বস}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{বাস}$ $\sqrt{\text{যুজ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{যোগ}$ $\sqrt{\text{ক্রুধ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{ক্রোধ}$ $\sqrt{\text{খদ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{খেদ}$ $\sqrt{\text{ভিদ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{ভেদ}$	$\sqrt{\text{ত্যজ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{ত্যাগ}$ $\sqrt{\text{পচ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{পাক}$ $\sqrt{\text{শুচ}}\text{ি}+\text{ঘঞ্চ} = \text{শোক}$

* গুণ হয়েছে।

◦ বৃদ্ধি হয়েছে।

তদ্বিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তদ্বিত প্রত্যয় ৩ প্রকার। যেমন- বাংলা তদ্বিত প্রত্যয়, বিদেশি তদ্বিত প্রত্যয় ও তৎসম বা সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়।

বাংলা তদ্বিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	
আ	চোৱ+আ = চোৱা কেষ্ট+আ = কেষ্টা	জল+আ = জলা গোদ+আ = গোদা

	ডিঙি+আ = ডিঙা বাঘ+আ = বাঘা হাত+আ = হাতা কাল+আ = কালা	রোগ+আ = রোগা চাল+আ = চালা লুন+আ = লুনা > লোনা
আই	বড়+আই = বড়াই চড়া+আই = চড়াই কানু+আই = কানাই নিম+আই = নিমাই বোন+আই = বোনাই নন্দ+আই = নন্দাই	জেঠা+আই = জেঠাই মির্ঠা+আই = মির্ঠাই ঢাকা+আই = ঢাকাই পাবনা+আই = পাবনাই চোর+আই = চোরাই মোগল+আই = মোগলাই
আমি/আম/ আমো/মি	ইতর+আমি = ইতরামি পাগল+আমি = পাগলামি চোর+আমি = চোরামি বাঁদর+আমি = বাঁদরামি ফাজিল+আমো = ফাজলামো	ঠক+আমো = ঠকামো ঘর+আমি = ঘরামি জেঠা+মি = জেঠামি ছেলে+মি = ছেলেমি
ই/ঈ	বাহাদুর+ই = বাহাদুরি উমেদার+ই = উমেদারি ডাঙ্কার+ঈ = ডাঙ্কারী মোক্তার+ঈ = মোক্তারী পোদ্দার+ঈ = পোদ্দারী ব্যাপার+ঈ = ব্যাপারী চাষ+ঈ = চাষী	জমিদার+ঈ = জমিদারী দোকান+ঈ = দোকানী ভাগলপুর+ঈ = ভাগলপুরী মাদ্রাজ+ঈ = মাদ্রাজী রেশম+ঈ = রেশমী সরকার+ঈ = সরকারী
ইয়া > এ	সেকাল+এ = সেকেলে একাল+এ = একেলে ভাদৰ+ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে পাথৰ+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে মাটি+ইয়া = মেটে বালি+ইয়া = বেলে জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে মোট+ইয়া = মুটে	খুন+ইয়া = খুনিয়া > খুনে না+ইয়া = নাইয়া > নেয়ে দেমাক+এ = দেমাকে টন্টন+এ = টন্টনে কলকল+এ = কলকনে গনগন+এ = গনগনে চকচক+এ = চকচকে
উয়া > ও	অ্বর+উয়া = অ্বরুয়া > অ্বরো বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো থড়+ও = থড়ো ধান+উয়া = ধেনো মাঠ+উয়া = মেঠো	গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো মাছ+উয়া = মাছুয়া > মেছো দাঁত+উয়া = দেঁতো ছাঁদ+উয়া = ছেঁদো তেল+উয়া = তেলো > তেলা কুঁজ+উয়া = কুঁজো
উ	ঢাল+উ = ঢালু	কল+উ = কলু
উক	লাজ+উক = লাজুক মিশ+উক = মিশুক	মিথ্যা+উক = মিথ্যুক
আরি/আৱী/ আৱ	ভিখ+আৱী = ভিখারী শাঁখ+আৱী = শাঁখারী	বোমা+আৱ = বোমারু

আলি/আলো/ আল>এল	দাঁত+আল = দাঁতাল লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল তেজ+আল = তেজাল ধার+আল = ধারাল শাঁস+আল = শাঁসাল জমক+আল = জমকালো	দুধ+আল = দুধাল > দুধেল হিম+আল = হিমাল > হিমেল চতুর+আলি = চতুরালি ঘটক+আলি = ঘটকালি সিঁদ+আল>এল = সিঁদেল গাঁজা+আল>এল = গেঁজেল
উরিয়া>উড়িয়া/ উড়ে/রে	হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে	কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে
উড়	লেজ+উড় = লেজুড়	
উয়া/ওয়া>ও	ঘর+ওয়া = ঘরোয়া	জল+উয়া = জলুয়া > জলো
আটিয়া/টে	তামা+আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে ঝগড়া+আটিয়া = ঝগড়াটিয়া	ভাড়া+আটিয়া = ভাড়াটে রোগা+আটিয়া = রোগাটে
অট>ট	ভরা+ট = ভরাট	জমা+ট = জমাট
লা	মেঘ+লা = মেঘলা এক+লা = একলা	আধ+লা = আধলা

সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়

প্রত্যয়		শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
মূল	যুক্ত হয়		
ইত		কুসুম+ইত = কুসুমিত তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত কণ্টক+ইত = কণ্টকিত	
ইমন	ইমা	নীল+ইমন = নীলিমা মহৎ+ইমন = মহিমা	
ইল		পক্ষ+ইল = পক্ষিল উর্মি+ইল = উর্মিল ফেন+ইল = ফেনিল	
ইর্ষ		গুরু+ইর্ষ = গরিষ্ঠ লঘু+ইর্ষ = লঘিষ্ঠ	
ইন/ঈ/ইন্নী		জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন সুখ+ইন = সুখিন গুণ+ইন = গুণিন মান+ইন = মানিন জ্ঞান+ইন্নী = জ্ঞানিন্নী গুণ+ইন্নী = গুণিন্নী	জ্ঞান+ইন(ঈ) = জ্ঞানী গুণ+ইন(ঈ) = গুণী
তা/ত্ব		শক্র+তা = শক্রতা বন্ধু+তা = বন্ধুতা বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব গুরু+ত্ব = গুরুত্ব ঘন+ত্ব = ঘনত্ব মহৎ+ত্ব = মহত্ব	

তর/তম		মধুর+তর = মধুরতর প্রিয়+তর = প্রিয়তর প্রিয়+তম = প্রিয়তম	
নীন	ঈন (ন ইং)	সর্বজন+নীন = সর্বজনীন কুল+নীন = কুলীন নব+নীন = নবীন	
নীয়	ঈয় (ন ইং)	জল+নীয় = জলীয় বায়ু+নীয় = বায়বীয় বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়	পর+নীয় = পরকীয় স্ব+নীয় = স্বকীয় রাজা+নীয় = রাজকীয়
বতুপ/মতুপ	বান/মান	গুণ+বতুপ = গুণবান দয়া+বতুপ = দয়াবান শ্রী+মতুপ = শ্রীমান বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান	
বিন	বী	মেধা+বিন = মেধাবী মায়া+বিন = মায়াবী তেজঃ+বিন = তেজস্বী যশঃ+বিন = যশস্বী	
র		মধু+র = মধুর মুখ+র = মুখর	
ল		শীত+ল = শীতল বৎস+ল = বৎসল	
ষ(অ)		মনু+ষ = মানব যদু+ষ = যাদব শিব+ষ = শৈব জিন+ষ = জৈন শক্তি+ষ = শাক্ত বুদ্ধি+ষ = বৌদ্ধ বিষ্ণু+ষ = বৈষ্ণব শিশি+ষ = শৈশব গুরু+ষ = গৌরব কিশোর+ষ = কৈশোর পৃথিবী+ষ = পার্থিব দেব+ষ = দৈব চিত্র+ষ = চৈত্র	নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ = সৌর (সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সূর+ষ = সৌর)
ষ্য(ম)		মনুঃ+ষ্য = মনুষ্য জমদগ্নি+ষ্য = জামদগ্ন্য সুন্দর+ষ্য = সৌন্দর্য শূর+ষ্য = শৌর্য ধীর+ষ্য = ধৈর্য কুমার+ষ্য = কৌমার্য পর্বত+ষ্য = পার্বত্য	

		বেদ+ষ্ট্য = বৈদ্য	
ষ্টি(ই)		রাবণ+ষ্টি = রাবণি দশরথ+ষ্টি = দাশরথি	
ষ্টিক(ইক)		সাহিত্য+ষ্টিক = সাহিত্যিক বেদ+ষ্টিক = বৈদিক বিজ্ঞান+ষ্টিক = বৈজ্ঞানিক সমুদ্র+ষ্টিক = সামুদ্রিক নগর+ষ্টিক = নাগরিক মাস+ষ্টিক = মাসিক ধর্ম+ষ্টিক = ধার্মিক সমর+ষ্টিক = সামরিক সমাজ+ষ্টিক = সামাজিক হেমন্ত+ষ্টিক = হেমন্তিক অকস্মাত+ষ্টিক = আকস্মিক	
ষ্টেয়(এয়)		ভগিনী+ষ্টেয় = ভগিনীয় অঞ্চিত+ষ্টেয় = আঞ্চিত্য বিমাত্র+ষ্টেয় = বৈমাত্রেয়	

বিদেশি তদ্বিত প্রত্যয়

প্রত্যয়		শব্দ গঠন	
হিন্দি	ওয়ালা>আলা	বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা দিল্লি+ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা	মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা
	ওয়াল>আন	গাড়ি+ওয়াল = গাড়িওয়াল	দার+ওয়াল = দারোয়াল
	আনা>আনি	মুন্শী+আনা = মুন্শীআনা/মুন্শিয়ানা বিবি+আনা = বিবিআনা/বিবিয়ানা	হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দ্যানি
	পনা	ছেলে+পনা = ছেলেপনা গিল্লী+পনা = গিল্লীপনা	বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা
	সা>সে	পানি+সা = পানিসা > পানসে এক+সা = একসা	কাল+সা = কালসা > কালসে
ফারসি	গর>কর	কারি+গর = কারিগর বাজি+গর = বাজিগর > বাজিকর	সওদা+গর = সওদাগর
	দার	খবর+দার = খবরদার তাঁবে+দার = তাঁবেদার বুটি+দার = বুটিদার	দেনা+দার = দেনাদার চৌকি+দার = চৌকিদার পাহারা+দার = পাহারাদার
	বাজ	কলম+বাজ = কলমবাজ ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ	ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ গলা+বাজ = গলাবাজ+ই = গলাবাজি

	বন্দী/বন্দ	জবান+বন্দী = জবানবন্দী সারি+বন্দী = সারিবন্দী	নয়র+বন্দী = নয়রবন্দী কোমর+বন্দ = কোমরবন্দ
সই (মত অর্থে)	জুত+সই = জুতসই মানান+সই = মানানসই চলন+সই = চলনসই টেক+সই = টেকসই	দ্রষ্টব্য : টিপসই ও নামসই- শব্দ দু'টোর 'সই' প্রত্যয় নয়, স্বাধীন শব্দ; সহি>সই (স্বাক্ষর)।	

সন্ধি

সন্ধি : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ, এখানে দুটি ধ্বনির মিলন হবে, এবং সেই দুটি ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থিত হবে। যেমন, 'নর + অধম = নরাধম'। এখানে 'নর'র শেষ ধ্বনি 'অ' (ন+অ+র+ অ), এবং 'অধম'র প্রথম ধ্বনি 'অ'। এখানে 'অ' ও 'অ' মিলিত হয়ে 'আ' হয়েছে।

সন্ধি ধ্বনির মিলন : সন্ধি নতুন শব্দ তৈরির একটি কৌশল, তবে এখানে সমাসের মতো নতুনভাবে সম্পূর্ণ শব্দ তৈরি হয় না। কেবল দুটো শব্দ মিলিত হওয়ার সময় পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনি দুটি মিলিত হয়। এই দুটি ধ্বনির মিলনের মধ্য দিয়ে দুটি শব্দ মিলিত হয়ে নতুন একটি শব্দ তৈরি করে। অর্থাৎ শব্দ দুটি মিলিত হয় না, ধ্বনি দুটি মিলিত হয়। উল্লেখ্য, একাধিক শব্দের বা পদের মিলন হলে তাকে বলে সমাস।

সন্ধির উদ্দেশ্য : সন্ধি মূলত দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয়। সুতরাং যেখানে সন্ধির মাধ্যমে এই দুটি উদ্দেশ্যই পূরণ হবে, সেখানেই কেবল সন্ধি করা যাবে। এগুলো হলো-

১. সন্ধির ফলে উচ্চারণ আরো সহজ হবে (স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা),
২. সন্ধি করার পর শুনতে আরো ভালো লাগবে (ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন)

[সন্ধি পড়ার জন্য স্পর্শ বর্ণের তালিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধ্বনি প্রকরণ ও উচ্চারণ বিধির অন্তর্গত তালিকাটি এখানে আবারো দেয়া হলো-

নাম	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
ক-বগীয় ধ্বনি (কর্ত্ত্য ধ্বনি)	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ-বগীয় ধ্বনি (তালব্য ধ্বনি)	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট-বগীয় ধ্বনি (মুর্ধন্য ধ্বনি)	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত-বগীয় ধ্বনি (দন্ত্য ধ্বনি)	ত	থ	দ	ধ	ন
প-বগীয় ধ্বনি (ওর্ণ্য ধ্বনি)	প	ফ	ব	ভ	ম

সন্ধি প্রথমত ২ প্রকার- বাংলা শব্দের সন্ধি ও তৎসম সংস্কৃত শব্দের সন্ধি।

বাংলা শব্দের সন্ধি

খাঁটি বাংলা শব্দ বা তচ্চব শব্দের যে সন্ধি, সেগুলোকেই বাংলা শব্দের সন্ধি বলে। বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে বলে স্বরসন্ধি।

বাংলা শব্দের স্বরসন্ধিতে দুটো সন্ধিহিত স্বরের একটি লোপ পায়। যেমন,

অ+এ = এ (অলোপ)	শত+এক = শতেক	কত+এক = কতেক	
আ+আ = আ (একটা আলোপ)	শাঁখা+আরি = শাঁখারি	রূপা+আলি = রূপালি	
আ+উ = উ (আলোপ)	মিথ্যা+উক = মিথ্যুক	হিংসা+উক = হিংসুক	নিন্দা+উক = নিন্দুক
ই+এ = ই (এলোপ)	কুড়ি+এক = কুড়িক আশি+এর = আশির	ধনি+ইক = ধনিক	গুটি+এক = গুটিক

ব্যঞ্জনসম্বন্ধ

স্বর আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরধ্বনিতে যে সম্বন্ধ হয়, তাকে ব্যঞ্জনসম্বন্ধ বলে। খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যঞ্জনসম্বন্ধ মূলত ধ্বনি পরিবর্তনের সমীভবনের নিয়ম মেলে হয়। এবং ব্যঞ্জনসম্বন্ধির ফলে সৃষ্টি শব্দগুলো মূলত কথ্যরীতিতেই সীমাবদ্ধ।

[সমীভবন] : দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন, ‘জন্ম’ (জ+অ+ন+ম+অ) -এর ‘ন’, ‘ম’-র প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ‘জন্ম’। সমীভবন মূলত ৩ প্রকার-

ক. প্রগত সমীভবন : আগের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, চক্র>চঙ্ক, পঞ্চ>পঞ্চ, পদ্ম>পদ, লঘ>লঘ, ইত্যাদি।

খ. পরাগত সমীভবন : পরের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, তৎ+জন্য>তজ্জন্য, তৎ+হিত>তদ্বিত, উৎ+মুখ>উন্মুখ, ইত্যাদি।

গ. অন্যেন্য সমীভবন : পাশাপাশি দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে দুটিই পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যেন্য সমীভবন বলে। যেমন, সত্য (সংস্কৃত)>সংষ্ঠ (প্রাকৃত), বিদ্যা (সংস্কৃত)>বিজ্ঞা (প্রাকৃত), ইত্যাদি।]

১. অংশীয় ধ্বনির পর ঘোষ ধ্বনি আসলে অংশীয় ধ্বনিটিও ঘোষ ধ্বনি হয়ে যাবে। যেমন, ছোট+দা = ছোড়দা।

২. হলন্ত র (র) -এর পরে অন্য কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে ‘র’ লুপ্ত হবে, পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিষ্ট হবে। যেমন, আর+না = আন্না, চার+টি = চাট্টি, ধর+না = ধন্না, দুর+ছাই = দুজ্জাই

৩. ত-বর্গীয় ধ্বনির (ত, থ, দ, ধ, ন) পরে চ-বর্গীয় ধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) আসলে আগের ধ্বনি লোপ পায়, পরের ধ্বনি (চ-বর্গীয় ধ্বনি) দ্বিষ্ট হয়। যেমন, নাত্ত+জামাই = নাজ্জামাই, বদ্ধ+জাত = বজ্জাত, হাত+ছানি = হাজ্জানি

৪. ‘প’ এর পরে ‘চ’ এলে আর ‘স’ এর পরে ‘ত’ এলে ‘চ’ ও ‘ত’ এর জায়গায় ‘শ’ হয়। যেমন, পাঁচ+শ = পাঁশশ, সাত+শ = সাশশ, পাঁচ+সিকা = পাঁশশিকা

৫. হলন্ত ধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরধ্বনিটি লোপ পাবে না। যেমন, বোন+আই = বোনাই, চুন+আরি = চুনারি, তিল+এক = তিলেক, বার+এক = বারেক, তিন+এক = তিনেক

৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন, কাঁচ+কলা = কাঁচকলা, নাতি+বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া+দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া+গাড়ি = ঘোড়গাড়ি

তৎসম শব্দের সম্বন্ধ

তৎসম শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যে সব শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সে সব শব্দের যে সম্বন্ধ হয়, তাকে বলে তৎসম শব্দের সম্বন্ধ। মূলত সম্বন্ধ বলতে এই তৎসম শব্দের সম্বন্ধকেই বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের তৎসম শব্দের সম্বন্ধ হয়- স্বরসম্বন্ধ, ব্যঞ্জনসম্বন্ধ ও বিসর্গসম্বন্ধ।

স্বরসম্বন্ধ

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সংক্ষি হলে তাকে বলে স্বরসংক্ষি। নিচে স্বরসংক্ষির নিয়মগুলো দেয়া হলো-
 ১. ‘অ/আ’ এরপরে ‘অ/আ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘আ’ হয় এবং তা প্রথম ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+অ = আ	নৱ+অধম = নৱাধম হিত+অহিত = হিতাহিত	প্রাণ+অধিক = প্রাণাধিক	হিম+অচল = হিমাচল	হস্ত+অন্তর = হস্তান্তর
অ+আ = আ	হিম+আলয় = হিমালয়	দেব+আলয় = দেবালয়	রং+আকর = রংকর	সিংহ+আসন = সিংহাসন
আ+আ = আ	যথা+অর্থ = যথার্থ	আশা+অতীত = আশাতীত	মহা+অর্ধ = মহার্ধ	কথা+অমৃত = কথামৃত
আ+আ = আ	বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়	কারা+আগার = কারাগার	মহা+আশয় = মহাশয়	সদা+আনন্দ = সদানন্দ

২. ‘অ/আ’ এরপরে ‘ই/ঈ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘এ’ হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ	শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা	পূর্ণ+ইন্দু = পূর্ণেন্দু	স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা	নৱ+ইন্দ্র = নবেন্দ্র
অ+ঈ = এ	পরম +ঈশ = পরমেশ	নৱ+ঈশ = নবেশ		
আ+ই = এ	যথা+ইষ্ট = যথেষ্ট			
আ+ঈ = এ	মহা+ঈশ = মহেশ	রমা+ঈশ = রমেশ		

৩. ‘অ/আ’ এরপরে ‘উ/উ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘ও’ হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও	সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়	নীল+উৎপল = নীলোৎপল	ফল+উদয় = ফলোদয়	হিত+উপদেশ = হিতোপদেশ
	পর+উপকার = পরোপকার	প্রশ+উত্তর = প্রশ্নোত্তর		
অ+উ = ও	গৃহ+উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব	চল+উর্মি = চলোর্মি	নব+উত্তা = নবোত্তা	
আ+উ = ও	যথা+উচিত = যথোচিত	মহা+উৎসব = মহোৎসব	যথা+উপযুক্ত = যথোপযুক্ত	
আ+উ = ও	গঙ্গা+উর্মি = গঙ্গোর্মি			

৪. অ/আ এরপরে ঝ কার থাকলে উভয়ে মিলে অর হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ঝ = অঝ	দেব+ঝষি = দেবষি	অধম+ঝণ = অধমণ	উত্তম+ঝণ = উত্তমণ	
আ+ঝ = আঝ	মহা+ঝষি = মহষি	রাজা+ঝষি = রাজষি		

৫. অ/আ এরপরে ঝত থাকলে অ/আ ও ঝত-র ঝ মিলে আর হয় এবং আর, ‘অ/আ’-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ঝ (ঝত) = আৱ	শীত+ঝত = শীতার্ত	ভয়+ঝত = ভয়াৰ্ত		
আ+ঝ (ঝত) = আৱ	তৃষ্ণা+ঝত = তৃষ্ণার্ত	ক্ষুধা+ঝত = ক্ষুধার্ত		

৬. অ/আ এরপরে এ/ঐ থাকলে উভয়ে মিলে ক্রি হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+এ = এ	জন+এক = জনৈক	হিত+এষী = হিতৈষী	সৰ্ব+এৰ = সৰৈৰ	
অ+ঐ = ঐ	মত+ঐক্য = মতৈক্য	অতুল+ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য		
আ+এ = এ	সদা+এৰ = সদৈৰ			
আ+ঐ = ঐ	মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য			

৭. অ/আ এরপরে ও/ও থাকলে উভয়ে মিলে ও হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ও = ও	বন+ওষধি = বনৌষধি			
অ+ও = ও	পৱন+ওষধ = পৱনৌষধ			
আ+ও = ও	মহা+ওষধি = মহৌষধি			
আ+ও = ও	মহা+ওষধ = মহৌষধ			

৮. ই/ঈ এরপরে ই/ঈ থাকলে উভয়ে মিলে ঈ হয় এবং তা ই/ঈ-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ	অতি+ইত = অতীত	গিরি+ইন্দ্র= গিরীন্দ্র	অতি+ইব= অতীব	প্রতি+ইত= প্রতীত
	রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র			
ই+ঈ = ঈ	পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা	প্রতি+ঈক্ষা= প্রতীক্ষা		
ঈ+ই = ঈ	সতী+ইন্দ্র = সতীন্দ্র	মহী+ইন্দ্র = মহীন্দ্র		
ঈ+ঈ = ঈ	সতী+ঈশ = সতীশ	ক্ষিতী+ঈশ= ক্ষিতীশ	শ্রী+ঈশ = শ্রীশ	পৃষ্ঠী+ঈশ = পৃষ্ঠীশ
	দিললী+ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর			

৯. ই/ঈ এরপরে ই/ঈ ছাড়া অন্য কোন স্বরক্ষনি থাকলে ই/ঈ-র জায়গায় য (য-ফলাংয়) হয় এবং তা ই/ঈ-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য-ফলা + অ	অতি+অন্ত = অত্যন্ত	প্রতি+অহ = প্রত্যহ	অতি+অধিক = অত্যধিক	আদি+অন্ত = আদ্যন্ত
	যদি+অপি = যদ্যপি	পরি+অন্ত = পর্যন্ত		

ই+আ = য-ফলা + আ	ইতি+আদি = ইত্যাদি	প্রতি+আশা = প্রত্যাশা	প্রতি+আবর্তন = প্রত্যাবর্তন	অতি+আশ্চর্য = অত্যাশ্চর্য
ই+উ = য-ফলা+ উ	অতি+উক্তি = অত্যুক্তি	অভি+উথান = অভূঞ্চান	অঞ্চিত+উৎপাত = অংগুৎপাত	প্রতি+উপকার = প্রত্যুপকার
ই+উ = য- ফলা+ উ	প্রতি+উষ = প্রত্যুষ			
ঈ+আ= য- ফলা+ আ	মসী+আধার = মস্যাধার			
ঈ+এ = য- ফলা+এ	প্রতি+এক = প্রত্যেক			
ঈ+অ = য- ফলা+অ	নদী+অশু = নদ্যস্ব			

১০. উ/উ এরপরে উ/উ থাকলে উভয়ে মিলে উ হয় এবং তা উ/উ-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+উ = উ	মরু+উদ্যান = মরুদ্যান			
উ+উ = উ	বহু+উর্ধ্ব = বহুৰ্ধ্ব			
উ+উ = উ	বধূ+উৎসব = বধূৎসব			
উ+উ = উ	ভূ+উর্ধ্ব = ভূৰ্ধ্ব			

১১. উ/উ এরপরে উ/উ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি থাকলে উ/উ-র জায়গায় ব (ব-ফলা, ব) হয় এবং তা ই/ঈ-র আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+অ = ব-ফলা+অ	সু+অল্প = স্বল্প	পশু+অধম = পশ্বধম	অনু+অয় = অৰ্বয়	মনু+অন্তর = মন্বন্তৰ
উ+আ = ব-ফলা+আ	সু+আগত = স্বাগত	পশু+আচার = পশ্বাচার		
উ+ই = ব-ফলা+ই	অনু+ইত = অন্বিত			
উ+ঈ = ব-ফলা+ঈ	তনু+ঈ = তন্বী			
উ+এ = ব-ফলা+এ	অনু+এষণ = অন্বেষণ			

১২. ঝ এরপরে ঝ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকলে ঝ এর জায়গায় র (র-ফলা, রংর) এবং র-ফলা ঝ এর আগের ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন, পিতৃ(প+ই+তঝ) + আলয় = পিত্রালয়
পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ

১৩. (ক) এ/ঝি এরপরে অন্য কোন স্বরধ্বনি আসলে ‘এ’ এর জায়গায় ‘অয়’ এবং ‘ঝি’ এর জায়গায় ‘আয়’ হয়।

এ+অ = অয়+অ	নে+অন = নয়ন	শে+অন = শয়ন
ঝি+অ = আয়+অ	নে+অক = নায়ক	গৈ+অক = গায়ক

(খ) ও/ও এরপরে অন্য কোন স্বরধ্বনি আসলে ‘ও’ এর জায়গায় ‘অব’ এবং ‘ঝি’ এর জায়গায় ‘আব’ হয়।

ও+অ = অব+অ	পো+অন = পৰন	লো+অন = লৰন
------------	-------------	-------------

ও+অ = আব+অ	পৌ+অক = পাবক		
ও+আ = অব+আ	গো+আদি = গবাদি		
ও+এ = অব+এ	গো+এষণা = গবেষণা		
ও+ই = অব+ই	পো+ইত্র = পবিত্র		
ও+ই = আব+ই	নৌ+ইক = নাবিক		
ও+উ = আব+উ	ভৌ+উক = ভাবুক		

১৪. যেসব স্বরসম্বন্ধি নিয়ম মানে না, নিয়ম ভেঙে সম্ভব হয় তাদের **নিপাতনে সিদ্ধ সম্ভব** বলে। যেমন, ‘কুল+অটা’ সম্ভব করে হওয়ার কথা ‘কুলটা’ (অ+অ = আ)। কিন্তু সম্ভব হওয়ার পর তা হয়ে গেছে ‘কুলটা’। তাই এটা **নিপাতনে সিদ্ধ সম্ভব**। যেমন-

নিপাতনে সিদ্ধ সম্ভব	
কুল+অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	গো+অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)
প্র+উত্ত = প্রোত্ত (প্রোত্ত নয়)	অন্য+অন্য = অন্যান্য (অন্যেন্য নয়)
মার্ত+অন্ত = মার্তভ্র (মার্তভ্র নয়)	শুন্দ+ওদন = শুন্দোদন (শুন্দোদন নয়)

ব্যঞ্জনসম্বন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সম্ভব হবে, তাদের একটিও যদি ব্যঞ্জনধ্বনি হয়, তাহলেই সেই সম্ভিকে ব্যঞ্জনসম্বন্ধি বলা হয়। ব্যঞ্জনসম্বন্ধি ৩ টা বিভিন্ন পদে হতে পারে-

১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি
৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি +

১. স্বরধ্বনির পর ‘ছ’ থাকলে তা দ্বিতীয় হয়, অর্থাৎ ‘ছ’-র বদলে ‘ছ’ হয়। যেমন-

অ+ছ = ছ	এক+ছত্র = একচ্ছত্র	মুখ+ছবি = মুখচ্ছবি	অঙ্গ+ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ	আলোক+ছটা=
	প্র+ছদ = প্রচ্ছদ	বৃক্ষ+ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া	স্ব+ছন্দ = স্বচ্ছন্দ	আলোকচ্ছটা
আ+ছ = ছ	কথা+ছলে = কথাছলে	আচ্ছা+দন = আচ্ছাদন		
ই+ছ = ছ	পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	বি+ছেদ= বিচ্ছেদ	পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	বি+চিন্ন = বিচ্ছিন্ন
	প্রতি+ছবি = প্রতিচ্ছবি			
উ+ছ = ছ	অনু+ছেদ = অনুচ্ছেদ			

ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনি +

১. ক, চ, ট, ত, প থাকলে এবং তাদের পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ, জ, ড (ড়), দ, ব হয়।

অর্থাৎ অধোৱ অল্পপ্রাণ ধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হয়ে যায়।

অর্থাৎ কোনো বর্গের প্রথম ধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো সেই বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হয়ে যায়। যেমন-

ক+অ = গ+অ	দিক+অন্ত = দিগন্ত		
ক+আ = গ+আ	বাক+আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর		
ক+টৈ = গ+টৈ	বাক+টৈশ = বাগীশ		
চ+অ = জ+অ	শিচ+অন্ত = শিজন্ত		
টে+আ = ড+আ	ষট্টে+আনন = ষড্টেনন		
ত্+অ = দ+অ	তৎ+অবধি = তদবধি	কৃৎ+অন্ত = কৃদন্ত	
ত্+আ = দ+আ	সৎ+আনন্দ = সদানন্দ		
ত্+ই = দ+ই	জগৎ+ইন্দ্র = জগদিন্দ্র		
ত্+উ = দ+উ	সৎ+উপায় = সদুপায়	সৎ+উপদেশ = সদুপদেশ	
প+অ = ব+অ	সুপ্র+অন্ত = সুবন্ত		

ব্যঞ্জনধনি ব্যঞ্জনধনি +

১. ক) 'ত/দ' এরপরে 'চ/ছ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ/ছ' হয়। যেমন-

ত্+চ = চ	সৎ+চিত্তা = সচিত্তা	উৎ+চারণ = উচ্চারণ	শৰৎ+চন্দ = শৰচন্দ
	সৎ+চরিত্র = সচরিত্র	সৎ+চিদানন্দ (চৎ+আনন্দ) = সচিদানন্দ	
ত্+ছ = ছ	উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ	তৎ+ছবি = তচ্ছবি	
দ্+চ = চ	বিপদ+চয় = বিপচ্য		
দ্+ছ = ছ	বিপদ+ছয়া = বিপচ্ছয়া		

থ) 'ত/দ' এরপরে 'জ/ঝ' থাকলে উভয়ে মিলে 'জ্জ/ঝ্ব' হয়। যেমন-

ত্+জ = জ	সৎ+জন = সজ্জন	উৎ+জ্বল = উচ্চজ্বল	তৎ+জন্য = তজ্জন্য
	যাবৎ+জীবন = যাবজ্জীবন	জগৎ+জীবন = জগজ্জীবন	
দ্+জ = জ	বিপদ+জাল = বিপচ্ছাল		
ত্+ঝ = ঝ	কুৎ+ঝটিকা = কুঝ্বটিকা		

গ) 'ত/দ' এরপরে 'শ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ' হয়। যেমন-

ত্+শ = চ+ছ = ছ	উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস	চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি	উৎ+শুধুল = উচ্ছুধুল
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------

ঘ) 'ত/দ' এরপরে 'ড/ত' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ/ত্ত' হয়। যেমন-

ত্+ড = ড	উৎ+তীব = উচ্ছীব		
ত্+ত = ত্ত	বৃহৎ+তক্ষা = বৃহচ্ছক্ষা		

ঙ) 'ত/দ' এরপরে 'হ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ' হয়। যেমন-

ত্+হ = ছ	উৎ+হার = উচ্ছার	উৎ+হত = উচ্ছত	উৎ+হত = উচ্ছত
দ্+হ = ছ	পদ+হতি = পচ্ছতি	তদ+হিত = তচ্ছিত	

চ) 'ত/দ' এরপরে 'ল' থাকলে উভয়ে মিলে 'ল্ল' হয়। যেমন-

ত্+ল = ল্ল	উৎ+লাস = উচ্ছ্লাস	উৎ+লেখ = উচ্ছ্লেখ	উৎ+লিখিত = উচ্ছ্লিখিত
	উৎ+লেখ্য = উচ্ছ্লেখ্য	উৎ+লজ্জন = উচ্ছ্লজ্জন	

২. কোনো অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি তার নিজের বর্ণের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

অর্থাৎ, ক, চ, ট, ত, প- এদের পরে গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ষ, ঝ, ঢ, ধ, ত কিংবা য, র, ব থাকলে প্রথম ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প) তার নিজের বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) হয়ে যায়। অর্থাৎ, বর্গের প্রথম ধ্বনিগুলোর কোনোটি থাকলে, এবং তার পরে বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ ধ্বনিগুলোর কোনোটি বা য, র, ব (এরা সবাই ঘোষ ধ্বনি) আসলে বর্গের প্রথম ধ্বনি তার নিজ বর্গের তৃতীয় ধ্বনি হয়।

যেমন-

ক+দ = গ+দ	বাক+দান = বাগদান	বাক+দেবী = বাগদেবী	
ক+ব = গ+ব	দিক+বিজয় = দিঘিজয়		
ক+জ = গ+জ	বাক+জাল = বাগজাল		
ট+য = ড+য	ষট+যন্ত্র = ষড়যন্ত্র		
ত+গ = দ+গ	উৎ+গার = উদ্গার	উৎ+গিরণ = উদ্গিরণ	সৎ+গুরু = সদ্গুরু
ত+ঘ = দ+ঘ	উৎ+ঘাটন = উদ্ঘাটন		
ত+ভ = দ+ভ	উৎ+ভব = উদ্ভব		
ত+য = দ+য	উৎ+যোগ = উদ্যোগ	উৎ+যম = উদ্যম	
ত+ব = দ+ব	উৎ+বন্ধন = উদ্বন্ধন		
ত+঱ = দ+঱	তৎ+঱প = তদ্বপ		

৩. নাসিক্য ধ্বনির পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি নিজ বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি বা নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়।

অর্থাৎ, ঙ, ছ, ণ, ন, ম- এদের পরে ক, চ, ট, ত, প থাকলে ক, চ, ট, ত, প যথাক্রমে গ, জ, ড, দ, ব অথবা ঙ, ছ, ণ, ন, ম হয়ে যায়।

অর্থাৎ, বর্গের পঞ্চম/ শেষ ধ্বনির পরে বর্গের প্রথম ধ্বনি আসলে বর্গের প্রথম ধ্বনি তার নিজ বর্গের তৃতীয় বা পঞ্চম/ শেষ ধ্বনি হয়ে যায়।

ক+ন = গ/ঙ+ন	দিক+নির্ণয় = দিগনির্ণয়/ দিঙনির্ণয়		
ক+ম = গ/ঙ+ম	বাক+ময় = বাঙময়		
ত+ন = দ/ন+ন	জগৎ+নাথ = জগঘ্নাথ	উৎ+নয়ন = উদ্ঘ্নয়ন	উৎ+নীতি = উদ্ঘ্নীতি
ত+ম = দ/ন+ম	তৎ+মধ্যে = তদ্বন্ধে/ তন্মধ্যে	মৃৎ+ময় = মৃঘ্নয়	তৎ+ময় = তন্ময়
	চিৎ+ময় = চিন্ময়		

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির চেয়ে নাসিক্য ধ্বনিটি অধিক প্রচলিত।

৪. ‘ম’-এর পরে কোনো বর্গীয় ধ্বনি বা স্পর্শ ধ্বনি আসলে ‘ম’ তার পরের ধ্বনির নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়।

অর্থাৎ, ‘ম’-এর পরে যে বর্গীয় ধ্বনি আসে, ‘ম’ সেই ধ্বনির বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়ে যায়।

ম+ক = ঙ+ক	শম+কা = শঙ্কা	ম+ভ = ম+ভ	কিম+ভূত = কিঙ্গুত
ম+চ = ছ+চ	সম+চয় = সঞ্চয়	ম+ন = ন্ন	কিম+নৰ = কিঙ্গৱ
ম+ত = ণ+ত	সম+তাপ = সন্তাপ		সম+ন্যাস = সংন্যাস
ম+দ = ন+দ	সম+দর্শন = সন্দর্শন	ম+ধ = ন্ধ	সম+ধান = সংঘান

উল্লেখ্য, আধুনিক বাংলায় ‘ম’-এর পরে ক-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ক-বর্গের নাসিক্য/ পঞ্চম ধ্বনি ‘ঙ’-র বদলে ‘ং’ হয়। যেমন, ‘সম+গত’-এ ‘ম’ ও ‘গ’ (ক-বর্গীয় ধ্বনি)’ সম্মিলিত হয়ে ‘ম’, ‘ঙ’ না হয়ে ‘ং’ হয়ে ‘সংগত’।

এরকম-

অহম+কার = অহংকার, সম+থ্যা = সংথ্যা

৫. ‘ম’-এর পরে অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল, ব) কিংবা উল্ল ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) থাকলে ‘ম’-এর জায়গায় ‘ং’ হয়।

সম+যম = সংযম	সম+বাদ = সংবাদ	সম+রক্ষণ = সংরক্ষণ	সম+লাপ = সংলাপ
সম+শ্য = সংশ্য	সম+সার = সংসার	সম+হার = সংহার	বারম+বার = বারংবার
কিম+বা = কিংবা	সম+বরণ = সংবরণ	সম+যোগ = সংযোগ	সম+যোজন = সংযোজন
সম+শোধন = সংশোধন	সর্বম+সহা = সর্বসহা	স্বয়ম+বরা = স্বয়স্বরা	

উল্লেখ্য, এই নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম- সম+রাট = সম্রাট।

৬. তালব্য অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে নাসিক্য ধ্বনি আসলে নাসিক্য ধ্বনিটিও তালব্য নাসিক্য ধ্বনি হয়।

অর্থাৎ, ‘চ/জ’ এর পরে ঙ, ফ, ন, ন, ম (নাসিক্য ধ্বনি) থাকলে সেগুলো ‘ঁ’ হয়ে যায়।

চ+ন = চ+ঁ	যাচ+না = যাঞ্চা	রাজ+নী = রাঞ্জী	
জ+ন = জ+ঁ	যজ+ন = যঞ্জ		

৭. ‘দ/ধ’-এর পরে অংশোষ বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় ‘ত’ (অংশোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি) হয়।

অর্থাৎ, ‘দ/ধ’-এর পরে ক, চ, ট, ত, প কিংবা থ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় ‘ত’ হয়।

দ> ত	তদ+কাল = তৎকাল	হদ+কম্প = হৎকম্প	তদ+পর = তৎপর
	তদ+ষ্ট = তষ্ট		
ধ> ত	শ্বুধ+পিপাসা = শ্বুৎপিপাসা		

৮. ঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (দ/ধ) এর পরে ‘স’ (দন্ত্য স ধ্বনি) থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় দন্ত্য অংশোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ‘ত’ হয়।

অর্থাৎ, ‘দ/ধ’ এর পরে ‘স’ থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় ‘ত’ হয়। যেমন-

বিপদ+সংকুল = বিপৎসংকুল (‘দ’ এরপরে ‘স’ থাকায় ‘দ’, ‘ত’ হয়ে গেছে)

তদ+সম = তৎসম

৯. ‘ষ’ (মূর্ধণ্য ষ ধ্বনি) এর পরে অংশোষ দন্ত্য ধ্বনি (ত, থ) থাকলে সেগুলো অংশোষ মূর্ধণ্য ধ্বনি (ট, ঠ) হয়ে যায়।

অর্থাৎ, ‘ষ’ এর পরে ‘ত/থ’ থাকলে সেগুলো যথাক্রমে ‘ট/ঠ’ হয়ে যায়। যেমন-

কৃষ+তি = কৃষ্টি (ষ+ত = ষ+ট)

ষষ্ঠ+থ = ষষ্ঠি (ষ+থ = ষ+ঠ)

১০. কিছু কিছু সন্ধি কিছু বিশেষ নিয়মে হয়। এগুলোকে বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি বলে।

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি			
উৎ+স্থান = উস্থান	উৎ+স্থাপন = উস্থাপন		
পরিং+কৃত = পরিষ্কৃত	পরিং+কার = পরিষ্কার		
সম+কৃত = সংস্কৃত	সম+কৃতি = সংস্কৃতি	সম+কার = সংস্কার	

মনে রাখার জন্য : উস্থান, উস্থাপন

পরিষ্কৃত, পরিষ্কার

সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সংস্কার

১১. যে সকল ব্যঞ্জনসম্বন্ধি কোনো নিয়ম না মেনে, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম করে সম্ভব হয়, তাদেরকে **নিপাতনে** সিদ্ধ সম্বন্ধি বলে। যেমন, ‘পতৎ+অঞ্জলি’, এখানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ‘ত’ এর সঙ্গে স্বরধ্বনি ‘অ’ এর সম্ভব হয়েছে। সুতরাং, সম্বন্ধির নিয়ম অনুসারে ‘ত’ এর জায়গায় ‘দ’ হওয়ার কথা। তার বদলে একটি ‘ত’ লোপ পেয়ে হয়েছে ‘পতঞ্জলি’। এরকম-

নিপাতনে সিদ্ধ সম্বন্ধি	
আ+চর্য = আশ্চর্য	গো+পদ = গোপদ
বন+পতি = বনস্পতি	বৃহৎ+পতি = বৃহস্পতি
তৎ+কর = তঙ্কর	পর+পর = পরম্পর
ষট+দশ = ষোড়শ	এক+দশ = একাদশ
পতৎ+অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মনস+ঈষা = মনীষা

মনে রাখার জন্য : আশ্চর্য, গোপদ

বনস্পতি, বৃহস্পতি

তঙ্কর, পরম্পর

ষোড়শ, একাদশ

পতঞ্জলি, মনীষা

বিসর্গ সম্বন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সম্ভব হবে, তাদের একটি যদি বিসর্গ হয়, তবে তাকে বিসর্গ সম্বন্ধি বলে। বিসর্গ সম্বন্ধি ২ ভাবে সম্পাদিত হয়-

১. বিসর্গ + স্বরধ্বনি

২. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি

[বিসর্গসম্বন্ধি ও ব্যঞ্জনসম্বন্ধির সম্পর্ক] : সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী শব্দ বা পদের শেষে ‘র’ বা ‘স’ থাকলে তাদের বদলে ‘ং’ বা অঘোষ ‘হ’ উচ্চারিত হয়। এর উপর ভিত্তি করে বিসর্গকে ২ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

র-জাত বিসর্গ : ‘র’ ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে র-জাত বিসর্গ বলে। যেমন : অন্তর- অন্তঃ, প্রাতর- প্রাতঃ, পুনর- পুনঃ, ইত্যাদি।

স-জাত বিসর্গ : ‘স’ ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে স-জাত বিসর্গ বলে। যেমন : নমস- নমঃ, পুনস- পুনঃ, শিরস- শিরঃ, ইত্যাদি।

মূলত, ‘ং’ হলো ‘র’ ও ‘স’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

এই র-জাত বিসর্গ ও স-জাত বিসর্গ উভয়েই মূলত ব্যঞ্জনধ্বনিরই অন্তর্গত। এই কারণে অনেকে বিসর্গ সম্বন্ধিকেও ব্যঞ্জনসম্বন্ধিরই অন্তর্গত বলে মনে করে।]

বিসর্গ+স্বরধ্বনি

‘অ’ স্বরধ্বনির পরে ‘ং’ থাকলে এবং তারপরে আবার ‘অ’ থাকলে অ+ং+অ = ‘ও’ হয়। যেমন- ততঃ+অধিক = ততোধিক

বিসর্গ+ব্যঞ্জনধ্বনি

১. (ক) ‘অ’-এর পরে স-জাত ‘ং’, এবং তারপরে ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তশ্ব ধ্বনি কিংবা হ থাকলে, ‘ং’-র জায়গায় ‘ও’ হয়।

অর্থাৎ, ‘অ’-এর পরে স-জাত ‘ং’, এবং তারপরে গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ষ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা ঙ, ঞ, ন, ম কিংবা য, র, ল, ব অথবা হ থাকলে আগের অ+ং=‘ও’ হয়।

অর্থাৎ, 'অ'-এর পরে স-জাত 'ং', এবং তারপরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম ধ্বনি থাকলে কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে আগের অ+ং='ও' হয়। যেমন-

তিরঃ+ধান = তিরোধান (অ+ং+ধ)	মনঃ+রম = মনোরম (অ+ং+র)
তপঃ+বন = তপোবন (অ+ং+ব)	মনঃ+হর = মনোহর (অ+ং+হ)

(খ) 'অ'-এর পরে র-জাত 'ং' থাকলে, এবং তারপরে স্বরধ্বনি কিংবা একই ধ্বনিগুলো থাকলে (ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি ও হ), 'ং'-র জায়গায় 'র' হয়। যেমন-

অন্তঃ+গত = অন্তর্গত (অ+ং+গ)	পুনঃ+আয় = পুনরায় (অ+ং+আ)
অন্তঃ+ধান = অন্তর্ধান (অ+ং+ধ)	পুনঃ+উক্ত = পুনরুক্ত (অ+ং+উ)
অন্তঃ+ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত (অ+ং+ভ)	পুনঃ+জন্ম = পুনর্জন্ম (অ+ং+জ)
অন্তঃ+বর্তী = অন্তর্বর্তী (অ+ং+ব)	পুনঃ+বার = পুনর্বার (অ+ং+ব)
অহঃ+অহ = অহরহ (অ+ং+অ)	পুনঃ+অপি = পুনরাপি (অ+ং+অ)
	প্রাতঃ+উত্থান = প্রাতরুদ্ধান (অ+ং+উ)

২. 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ং' থাকলে এবং তারপরে অ, আ, ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি কিংবা হ থাকলে 'ং'-র জায়গায় 'র' হয়।

অর্থাৎ, 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ং' থাকলে এবং তারপরে অ, আ কিংবা, গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ষ, ঝ, চ, ধ, ভ কিংবা ঙ, ফ, ণ, ন, ম কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে 'ং'-র জায়গায় 'র' হয়।

অর্থাৎ, 'অ/আ' ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে 'ং' থাকলে এবং তারপরে অ, আ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে 'ং'-র জায়গায় 'র' হয়। যেমন-

নিঃ+আকার = নিরাকার (ই+ং+আ)	দুঃ+যোগ = দুর্যোগ (উ+ং+য)
নিঃ+আকরণ = নিরাকরণ (ই+ং+আ)	দুঃ+লোভ = দুর্লোভ (উ+ং+ল)
নিঃ+জন = নির্জন (ই+ং+জ)	দুঃ+অন্ত = দুরুন্ত (উ+ং+অ)
আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ (ঈ+ং+ব)	প্রাদুঃ+ভাব = প্রাদুর্ভাব (উ+ং+ভ)
জ্যোতিঃ+ময় = জ্যোতির্ময় (ই+ং+ম)	বহিঃ+গত = বহিগত (ই+ং+গ)

ব্যতিক্রম : 'ই/উ+ং+র' হলে 'ং' লোপ পায় এবং 'ং'-র আগের ত্রুটি স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়। যেমন- 'নিঃ+রব', এখানে 'ন+ই+ং'-এর 'ই+ং'-এর পরে 'র' ধ্বনির সম্মিলন হয়েছে। সুতরাং এখানে 'ং' লোপ পাবে এবং 'ই'-র জায়গায় 'ঈ' হবে। অর্থাৎ সম্মিলন হবে 'নিঃ+রব = নীরব'। এরকম- **নিঃ+রস = নীরস।**

৩. বিসর্গের পরে তালব্য অঘোষ ধ্বনি (চ, ছ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় তালব্য শিশ (শ) ধ্বনি, বিসর্গের পরে মূর্ধণ অঘোষ ধ্বনি (ট, ঠ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় মূর্ধণ শিশ (ষ) ধ্বনি, বিসর্গের পরে দন্ত অঘোষ ধ্বনি (ত, থ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় দন্ত শিশ (স) ধ্বনি হয়। অর্থাৎ,

'ং'-এর পরে 'চ/ছ' (তালব্য) থাকলে 'ং'-এর জায়গায় 'শ'

'ং'-এর পরে 'ট/ঠ' (মূর্ধণ) থাকলে 'ং'-এর জায়গায় 'ষ'

'ং'-এর পরে 'ত/থ' (দন্ত) থাকলে 'ং'-এর জায়গায় 'স' হয়। যেমন-ং:

+চ/ছ = শ+চ/ছ	নিঃ+চয় = নিশ্চয়	শিরঃ+ছেদ = শিরশ্চেদঃ
+ট/ঠ = ষ+ট/ঠ	ধনুঃ+টকার = ধনুষ্টকার	নিঃ+ঠুর = নির্তুরঃ
+ত/থ = স+ত/থ	দুঃ+তর = দুষ্টর	দুঃ+থ = দুষ্ট

8. (ক) ‘অ/আ’ স্বরধ্বনির পরে ‘ংঃ’ থাকলে এবং তারপরে অধোষ কর্ত্ত্য বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি (ক, থ, প, ফ) থাকলে ‘ংঃ’-র জায়গায় অধোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয়।

অর্থাৎ, ‘অ/আ’-এর পরে ‘ংঃ’ থাকলে এবং তারপরে ‘ক/থ/প/ফ’ থাকলে ‘ংঃ’-র জায়গায় ‘স’ হয়।

(খ) ‘অ/আ’ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনির পরে ‘ংঃ’ থাকলে এবং তারপরে অধোষ কর্ত্ত্য বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি (ক, থ, প, ফ) থাকলে ‘ংঃ’-র জায়গায় অধোষ মূর্ধণ্য শিশ ধ্বনি(ষ) হয়।

অর্থাৎ, ‘অ/আ’-এর পরে ‘ংঃ’ থাকলে এবং তারপরে ‘ক/থ/প/ফ’ থাকলে ‘ংঃ’-র জায়গায় ‘ষ’ হয়।

যেমন-

(ক) অ/আ+ংঃ+ক/থ/প/ফ	(খ) ই/ঈ/উ/উ/এ/ঝি/ও/ওঃ+ক/থ/প/ফ		
নমঃ+কার = নমস্কার	পদঃ+খলন = পদস্থলন	নিঃ+কার = নিষ্কার	দুঃ+কার = দুষ্কার
পুরঃ+কার = পুরস্কার		নিঃ+ফল = নিষ্ফল	দুঃ+প্রাপ্য = দুষ্প্রাপ্য
মনঃ+কামনা = মনস্কামনা	বাচঃ+পতি = বাচস্পতি	নিঃ+পাপ = নিষ্পাপ	দুঃ+কৃতি = দুষ্কৃতি
তিরঃ+কার = তিরস্কার		বহিঃ+কৃত = বহিষ্কৃত	চতুঃ+কোণ = চতুর্ষ্কোণ
ভাঃ+কর = ভাস্কর		বহিঃ+কার = বহিষ্কার	চতুঃ+পদ = চতুর্ষ্পদ
		আবিঃ+কার = আবিষ্কার	

৫. ‘ংঃ’-র পরে স্ত, স্থ কিংবা স্প যুক্তব্যঞ্জনগুলো থাকলে পূর্ববর্তী ‘ংঃ’ অবিকৃত থাকে কিংবা লোপ পায়।

যেমন-

নিঃ+স্তৰ্ক = নিঃস্তৰ্ক/ নিস্তৰ্ক

দুঃ+স্থ = দুঃস্থ/ দুষ্ট

নিঃ+স্পন্দ = নিঃস্পন্দ/ নিস্পন্দ

৬. কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্ধির পরও ‘ংঃ’ থেকে যায়। যেমন-

প্রাতঃ+কাল = প্রাতঃকাল

মনঃ+কষ্ট = মনঃকষ্ট

শিরঃ+পীড়া = শিরঃপীড়া

৭. কয়েকটি **বিশেষ বিসর্গ সংক্ষি** (এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ বা বিশেষ নিয়মে সাধিত সংক্ষি নয়। এগুলো কেবলই বিসর্গ সংক্ষি) -

বিশেষ বিসর্গ সংক্ষি	
বাচঃ+পতি = বাচস্পতি	অহঃ+নিশা = অহর্নিশ
ভাঃ+কর = ভাস্কর	অহঃ+অহ = অহরহ

সমাস

[প্রথমেই আমার একটা টেকনিক দিচ্ছি, নিচের লাইন দুটো মনে রাখলে সমাসের মূল অংশ শেখা হবে।
**বিবি করে স্বাদি, বিপু হল - পর
অপূর্বও সমন্বন্ধে বিহী যে অপূর্ব**

[ব্যাখ্যা: বিবি করে= বিশেষ্য ও বিশেষণ এর মধ্যে যে সমাস তা কর্মধারয় সমাস।

স্বাদি = সংখ্যাবাচক শব্দ সমষ্টি/সমাহার বুরোলে হয় দ্বিগুণ সমাস

বিপু = বিভক্তি লোপ পেয়ে হয় তৎপূরুষ সমাস

পর এর অর্থ হল উপরের তিনিটিই পরপরের অর্থ প্রাধান্য থাকে।

অপূর্ব= অব্যয়মোগে নিষ্পত্তি সমাস অব্যয়ীভাব সমাস। এতে পূর্ব পদের (অব্যয়) অর্থ প্রাধান্য থাকে।

সমন্বন্ধে= সমস্যমান সকল পদের অর্থের প্রাধান্য সমান থাকলে তা দ্বন্দ্ব সমাস।

বিহী যে অপূর্ব= সমস্যমান কোন পদের অর্থ না বুঝিয়ে অপূর্ব কোন অর্থ বুঝায় তা বহুবীহি সমাস।]

অথবা, নিচের ছন্দটি মুখস্থ রাখুন:

ও"হ্বন্দ" যারার মিলে যদি হ-এবং-,
সমাহারে হলে নয় সেটা মন্দ।। "দ্বিগুণ"
যেতিনি -যে টা-যেটি-যিনি- "কর্মধারায়",
যে"বহুবীহি" যার শেষে থাকলে তারে- কয়।।
অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পেলে "অব্যয়ী" মেলে,
বিভক্তি লোপ পেলেতাকে "তৎপূরুষ" বলে।।

বিস্তারিত আলোচনা:

সমাস: সমাস শব্দের অর্থ মিলন। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের মিলিত হয়ে একটি নতুন শব্দ তৈরির ব্যকরণ সম্মত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সমাস। মূলত, সমাসে একটি বাক্যাংশ একটি শব্দে পরিণত হয়। সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।

বাক্যে শব্দের ব্যবহার কমানোর উদ্দেশ্যে সমাস ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য, সমাস অর্থ সম্বন্ধপূর্ণ একাধিক শব্দের মিলন। আর সঞ্চি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনির মিলন। সমাসের জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা/ টার্মস জানা খুবই জরুরি। এগুলো হলো-

ব্যাসবাক্য: যে বাক্যাংশ থেকে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। একে সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্যও বলা হয়।

সমস্ত পদ: ব্যাসবাক্য থেকে সমাসের মাধ্যমে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় সমস্ত পদ।

সমস্যমান পদ: ব্যাসবাক্যের যে সব শব্দ সমস্ত পদে অন্তর্গত থাকে, সমস্ত পদের সেই সব শব্দকে সমস্যমান পদ বলে।

পূর্বপদ : সমস্ত পদের প্রথম অংশ/ শব্দকে পূর্বপদ বলে। অর্থাৎ, সমস্ত পদের প্রথম সমস্যমান পদই পূর্বপদ।

পরপদ/ উত্তরপদ: সমস্ত পদের শেষ অংশ/ শব্দকে পরপদ/ উত্তরপদ বলে। অর্থাৎ, সমস্ত পদের শেষ সমস্যমান পদই পরপদ।

যেমন, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

এখানে ব্যাসবাক্য হলো- ‘সিংহ চিহ্নিত আসন’। আর সমস্ত পদ হলো ‘সিংহাসন’। সমস্যমান পদ হলো ‘সিংহ’ আর ‘আসন’। এদের মধ্যে ‘সিংহ’ পূর্বপদ, আর ‘আসন’ পরপদ।

আবার, আমিষের অভাব = নিরামিষ

এখানে, পূর্বপদ ‘নিঃ’ বা অভাব। আর পরপদ হলো ‘আমিষ’।

উল্লেখ্য, একই সমস্ত পদ কয়েকভাবে ভেঙে কয়েকটি ব্যাসবাক্য তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক ব্যাসবাক্যও কয়েকটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য অনুযায়ী সেটি কোন সমাস তা নির্ণয় করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যাসবাক্যের সঙ্গে সমস্ত পদের অর্থসংজ্ঞি যেন ঠিক থাকে। যেমন, ‘বিপদে আপন্ন = বিপদাপন্ন’, এই সমাসটি এভাবে ভাঙলে তা ভুল হবে। এটা করতে হবে ‘বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন’।

প্রকারভেদ: সমাস প্রধানত ৬ প্রকার- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুবীহি, দ্বিগুণ ও অব্যয়ীভাব।

তবে অনেকেই দ্বিগুণ সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। আবার অনেকে কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য বিবেচনা করে তারা এই মত দিয়ে থাকেন। সমস্যমান পদ বা পূর্বপদ-পরপদের অর্থ প্রাধান্য বিবেচনা করলে মূলত সমাস ৪ প্রকার- দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুবীহি ও অব্যয়ীভাব।

এছাড়াও কিছু অপ্রধান সমাসও রয়েছে। যেমন- প্রাদি, নিত্য, অলুক, প্রভৃতি।

অর্থ প্রাধান্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য	পরপদের অর্থ প্রাধান্য	সমাস
আছে	আছে	দ্বন্দ্ব
নেই	আছে	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগুণ
আছে	নেই	অব্যয়ীভাব
নেই	নেই	বহুবীহি

নিচে বিভিন্ন সমাসের বর্ণনা দেয়া হলো।

দ্বন্দ্ব সমাস:

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ- উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এই সমাসে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ স্থাপনে ও, এবং, আর- এই তিনটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন- মা ও বাপ = মা-বাপ। এখানে পূর্বপদ ‘মা’ ও পরপদ ‘বাপ’। ব্যাসবাক্যে ‘মা’ ও ‘বাপ’ দুইজনকেই সমান প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, এবং দুজনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বপদ ও পরপদ, উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য রাখ্নিত হয়েছে। তাই এটি দ্বন্দ্ব সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে শুধুমাত্র “এবং, ও, আর” এই তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়।

(জায়া ও পতি=দম্পত্তি, ভাল এবং মন্দ=ভালমন্দ)

২। সমস্ত পদে অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। (সাত-সতের, ধূতি-চাদর)

৩। সমস্ত পদে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত বা স্বীবাচক পদ পূর্বে বসে। (শিক্ষক-ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারী, মা-বাবা)

মিলনার্থক শব্দমোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	মা-বাপ, মাসি-পিসি, জিন-পরি, চা-বিস্কুট
বিরোধার্থক শব্দমোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	আকাশ-পাতাল, দা-কুমড়া, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
বিপরীতার্থক শব্দমোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	আয়-ব্যায়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান
অঙ্গবাচক শব্দমোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুক্তি, নাক-মুখ ইত্যাদি।
সংখ্যাবাচক শব্দমোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
সমার্থক শব্দমোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি

	।
প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব	কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর ইত্যাদি।
দুটো সর্বনামযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুষি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
দুটো ক্রিয়াযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-কেরা, দেওয়া-থেওয়া ইত্যাদি।
দুটো ক্রিয়া বিশেষণ যোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	ধীরে-সুস্থে, আগে-পিছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
দুটো বিশেষণযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস	ভাল-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।
বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ	হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ, সাহেব-বিবি-গোলাম ইত্যাদি
অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ দাও।	দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। মূলত, এই সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদ পূর্বপদ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ব্যাসবাক্যটিতে ক্রি বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয়। অর্থাৎ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। এখানে, পূর্বপদ ‘নীল’ বিশেষণ ও পরপদ ‘পদ্ম’ বিশেষ্য। ব্যাসবাক্যে ‘পদ্ম’ সম্পর্কে বলা হয়েছে পদ্মটি ‘নীল’ রঙের। অর্থাৎ, ‘পদ্ম’ বা পরপদের অর্থই এখানে প্রধান, পরপদ ছাড়া পূর্বপদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই এটি কর্মধারয় সমাস।

কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-

- দুইটি বিশেষণ একই বিশেষ্য বোঝালে সেটি কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। এখানে পরবর্তী বিশেষ্যটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাঞ্চে বলে এটি দ্বন্দ্ব সমাস হবে না।
- দুইটি বিশেষ্য একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে সেটিও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব। একই কারণে এটি দ্বন্দ্ব না কর্মধারয় হবে।
- কার্যে পরপম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা। এখানে ‘মোছা’ কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- পূর্বপদে স্তীবাচক বিশেষণ থাকলে তা পুরুষবাচক হয়ে যাবে। যেমন, সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা
- বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে মহা হয়। মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান
- পূর্বপদে ‘কু’ বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে ‘কু’, ‘কৎ’ হয়। যেমন, কু যে অর্থ = কদর্থ।
- পরপদে ‘রাজা’ থাকলে ‘রাজ’ হয়। যেমন, মহান যে রাজা = মহারাজ।
- বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষ্য আগে এসে বিশেষণ পরে চলে যায়। যেমন, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ।

কর্মধারয় সমাস মূলত ৪ প্রকার-

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলো লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন, ‘স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ’। এখানে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ ‘রক্ষার্থে’

লোপ পেয়েছে। পূর্বপদ ‘স্মৃতি’ এখানে বিশেষণ ভাব বোঝাচ্ছে। আর ‘সৌধ’ বিশেষ। এটিরই অর্থ প্রধান। সুতরাং এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।
 (উপমান ও উপমিতি কর্মধারয় সমাস আলাদা করে চেনার আগে কতোগুলো সংজ্ঞা/ টার্মস জানা জরুরি। সেগুলো হলো- উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্ম। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হলে যাকে তুলনা করা হলো, তাকে বলা হয় উপমেয়। আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান। আর উপমেয় আর উপমানের যে গুণটি নিয়ে তাদের তুলনা করা হয়, সেই গুণটিকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। যেমন, ‘অরুণের ন্যায় রাঙা প্রভাত’। এখানে ‘প্রভাত’কে ‘অরুণ’র মতো ‘রাঙা’ বলে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, এখানে ‘প্রভাত’ উপমেয়। উপমান হলো ‘অরুণ’। আর প্রভাত আর অরুণের সাধারণ ধর্ম হলো ‘রাঙা’।)

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ

রান্নাঘর	রান্না করার ঘর	হাতপাথা	হাত দ্বারা চালিত পাথা
পলান্ন	পল(মাংস) মিশ্রিত অন্ন	আয়কর	আয়ের উপর কর
সাহিত্যসভা	সাহিত্য বিষয়ক সভা	বটবৃক্ষ	বট নামক বৃক্ষ
জনসভা	জনগণ বিষয়ক সভা	একাদশ	একের অধিক দশ
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	প্রীতিভোজ	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ
ঘরজামাই	ঘরে আশ্রিত জামাই	গোবরগণেশ	গোবরে নির্মিত গণেশ
সংবাদপত্র	সংবাদ বহনকারী পত্র	হাসিমুখ	হাসি মাথা মুখ
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	রাষ্ট্রবীতি	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি
বাঞ্চাল	বাঞ্চ চালিত যান	চিনিকল	চিনি উৎপাদনের কল
ভিক্ষাল	ভিক্ষা লক্ষ অল্ল	জীবনবীমা	জীবন নাশের অশঙ্কায় যে বিমা
নারীদিবস	নারীদের জন্য দিবস	আক্লেদাঁত	আক্লেসূচক দাঁত
সিংহদ্বার	সিংহ চিহ্নিত দ্বার	মোমবাতি	মোম নির্মিত বাতি
হাতঘড়ি	হাতে পরবার ঘড়ি	ঘোষণাপত্র	ঘোষণা সম্বলিত যে পত্র
গণতন্ত্র	গণের দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র	জোৎস্নারাত	জোৎস্না শোভিত রাত
দুধভাত	দুধ মাথা ভাত	জীবনবীমা	জীবন রক্ষার জন্য বীমা
ঘিভাত	ঘি মাথা ভাত	ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট

উপমান কর্মধারয় সমাস: সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। অর্থাৎ, উপমান ও উপমেয় কর্মধারয়ের মধ্যে যেটিতে সাধারণ ধর্মবাচক পদ থাকবে, সেটিই উপমান কর্মধারয়। যেমন, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র। এখানে ‘তুষার’র সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তুলনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এটি উপমান। আর সাধারণ ধর্ম হলো ‘শুভ্র’। উপমেয় এখানে নেই। সুতরাং, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।

উপমান কর্মধারয় সমাস এর উদাহরণ

কুলশুভ্র	কুল্দের মতো শুভ্র	হিমশীতল	হিমের ন্যায় শীতল
ফুটিফাটা	ফুটির মতো ফাটা	মিশকালো	মিশির মত কালো
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	গোবেচারা	গো-র ন্যায় বেচারা
ঘনশ্যাম	ঘনের ন্যায় শ্যাম	শশব্যন্ত	শশকের ন্যায় ব্যন্ত
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা

হরিণচপল	হরিণের ন্যায় চপল	তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ	বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	প্রস্তৱকঠিন	প্রস্তৱের ন্যায় কঠিন
বিড়ালতপস্তী	বিড়ালের ন্যায় তপস্তী	অগ্নিশর্মা	অগ্নির ন্যায় শর্মা
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো		

উপমিত কর্মধারয় সমাস: উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে সাধারণ ধর্ম উল্লেখ করা থাকে না। অর্থাৎ, উপমান ও উপমিত কর্মধারয়ের মধ্যে যেটিতে সাধারণ ধর্মবাচক পদ থাকবে না, সেটিই উপমিত কর্মধারয় সমাস। যেমন, ‘পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ’। এখানে ‘পুরুষ’কে ‘সিংহ’র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ‘পুরুষ’ উপমেয় আর ‘সিংহ’ উপমান। সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। সুতরাং, এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

উপমিত কর্মধারয় সমাস এর উদাহরণ

পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	বীরসিংহ	বীর সিংহের ন্যায়
চরণপদ্ম	চরণ পদ্মের ন্যায়	বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	নরসিংহ	নর সিংহের ন্যায়
কথামৃত	কথা অমৃতের ন্যায়	অধরপল্লব	অধর পল্লবের ন্যায়
নয়নপদ্ম	নয়ন পদ্মের ন্যায়	ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়
পাদপদ্ম	পাদ পদ্মের ন্যায়	করকমল	কর কমলের ন্যায়

রূপক কর্মধারয় সমাস: উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এটির ব্যাসবাক্যে উপমেয় ও উপমান পদের মাঝে ‘রূপ’ শব্দটি অথবা ‘ই’ শব্দাংশটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘মন রূপ মাঝি = মনমাঝি’। এখানে ‘মন’ উপমেয় ও ‘মাঝি’ উপমান। কিন্তু এখানে তাদের কোন নির্দিষ্ট গুণের তুলনা করা হয়নি। মনকেই মাঝি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

রূপক কর্মধারয় সমাস এর উদাহরণ

বিদ্যাধন	বিদ্যা রূপ ধন	চিত্তকোর	চিত্ত রূপ চকোর
চন্দ্রমুখ	চন্দ্র রূপ মুখ	যৌবনবন	যৌবন রূপ বন
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	শুধানল	শুধা রূপ অনল
বিষাদসিঞ্চু	বিষাদ রূপ সিঞ্চু	শোকসাগর	শোক রূপ সাগর
ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ অনল	বিদ্যাসাগর	বিদ্যা রূপ সাগর
সংসারসাগর	সংসার রূপ সাগর	মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা
হৃদয়মন্দির	হৃদয় রূপ মন্দির	জীবনশ্রোত	জীবন রূপ শ্রোত
আনন্দসাগর	আনন্দ রূপ সাগর	জীবনতরী	জীবন রূপ তরী
ভবনদী	ভব রূপ নদী	জ্ঞানবৃক্ষ	জ্ঞান রূপ বৃক্ষ
পরানপাথি	পরান রূপ পাথি	জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ
শোকানল	শোক রূপ অনল	সুখসাগর	সুখ রূপ সাগর

[টেকনিক: উপমান উপমিত ও রূপক বুঝতে যদি সমস্যা হয় নিচের টেকনিক পড়ুন:

বজ্রের ন্যায় কঠিনবজ্রকঠিন =; এখানে (বজ্র) noun এবং (কঠিন) adjective ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটি তুলনা বুঝাচ্ছে, এটি কর্মধারয় সমাস। যদি noun এবং adjective থাকে তা উপমান কর্মধারয়। আবার, পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষসিংহ =; এখানে (পুরুষ) noun এবং (সিংহ) noun ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটি তুলনা বুঝাচ্ছে, এটি কর্মধারয় সমাস। যদি noun এবং noun থাকে তা উপমিত কর্মধারয় সমাস।

অথবা, না বুঝলে নিচের ব্যাখ্যা পড়ুন,

ত্রুমৰকালো -এখানে দুটি পদ দেখা যাচ্ছে একটি হচ্ছে ত্রুমৰ অপরটি হচ্ছে কালো। দুটি পদ মিলেই কিন্তু ত্রুমৰকালো। মনে রাখতে হবে যে, সমস্যমান পদের পূর্বপদ এবং পরপদের মধ্যে যদি প্রাকৃতিক ভাবে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে সেই সমাস উপমান ছাড়া কিছুই নয়। ধর্মণ 'তুষার শুভ্র', আপনি জানেন যে, তুষার সাদা আর পরপদেও সাদা উল্লেখ আছে, সুতরাং উপমান কর্মধারয় ছাড়া কিছুই হবে না।

উপমান=(পূর্বপদ+পরপদ) -হ্যা (প্রাকৃতিক সাদৃশ্য আছে)

উপমিত=(পূর্বপদ+পরপদ) - না (প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নেই)

মুখচন্দ্র= মুখের আভয়ব কখনো চন্দ্রের মত দেখায় না, যেহেতু এখানে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে ন্যাচারালি মিল দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং তাই উপমিত কর্মধারয়।

আচ্ছা এখন 'শোকানল' কোন সমাস হবে ? আমার কথা অনুযায়ী তো উপমিত কর্মধারয় হওয়ারই কথা, তাই না ? কিন্তু উপমিত না হয়ে রূপক কর্মধারয় হল কেমনে ? চলুন জেনে নেওয়া যাক মূল সমস্যা কোথায়।

*যদি সমস্যমান পদটির পূর্বপদ দৃশ্যমান হয় তাহলে উপমিত কর্মধারয়, অন্যক্ষেত্রে রূপক কর্মধারয় হয়ে থাকে।

সাধারণ কর্মধারয় সমাস			
মহাজন	মহৎ যে জন	শ্বেতবন্ধ	শ্বেত যে বন্ধ
নীলোৎপল	নীল যে উৎপল	মন্দভাগ্য	মন্দ যে ভাগ্য
সত্ত্বে লোক	সত্ত্বে যে লোক	চলচ্ছিত্র	চলত্ব যে চিত্র
রাজকমল	রাজ যে কমল	নবঘৌবন	নব যে ঘৌবন
পান্তুলিপি	পান্তু যে লিপি	নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম
সুন্দরলতা	সুন্দরী যে লতা	মহারাজ	মহান যে রাজা
মহাকীর্তি	মহত্তী যে কীর্তি	নরাধম	অধম যে নর
মহানবী	মহান যে নবী	আলুসিন্ধ	সিন্ধ যে আলু
কদর্থ	কু যে অর্থ	প্রিয়সখা	প্রিয় যে সখা
কদাচার	কু যে আচার	সুখবর	সু যে খবর

তৎপুরুষ সমাস:

যে সমাসে পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পায়, এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। পূর্বপদের যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। তবে মাঝে মাঝে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে অবিকৃত থেকে যায়। তখন সেটাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ। (অলুক মানে লোপ না পাওয়া, অ-লোপ)।

যেমন, দুঃখকে প্রাপ্তি = দুঃখপ্রাপ্তি। এখানে পূর্বপদ ‘দুঃখ’র সঙ্গে থাকা দ্বিতীয়া বিভক্তি ‘কে’ লোপ পেয়েছে। আবার পরপদ ‘প্রাপ্তি’র অর্থই এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখ প্রাপ্তি হয়েছে বলেই নতুন শব্দের প্রয়োজন হয়েছে, যার জন্য বাক্যাংশটিকে সমাস করে নতুন শব্দ বানানো হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পেয়েছে, এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য রাখিত হয়েছে। তাই এটি তৎপুরুষ সমাস।

বহুবীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনটিরই অর্থের প্রাধান্য রাখিত হয় না, বরং সমস্ত পদ তৃতীয় কোন শব্দকে বোঝায়, তাকে বহুবীহি সমাস বলে। যেমন, মহান আস্তা যার = মহাজ্ঞা। এখানে পূর্বপদ ‘মহান’ (মহা) ও পরপদ ‘আস্তা’। কিন্তু সমস্ত পদ ‘মহাজ্ঞা’ দ্বারা মহান বা আস্তা কোনটাকেই না বুঝিয়ে এমন একজনকে বোঝাচ্ছে, যিনি মহান, যার আস্তা বা হৃদয় মহৎ। আবার, মহাজ্ঞা বলতে মহাজ্ঞা গান্ধীকেও বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কোন অর্থেই পূর্বপদ বা পরপদকে বোঝানো হচ্ছে না। অর্থাৎ, পূর্বপদ বা পরপদ, কোনটারই অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে না। সুতরাং, এটি বহুবীহি সমাসের উদাহরণ।

(উল্লেখ্য, বহুবীহি সমাস, বিশেষ করে কিছু ব্যাধিকরণ বহুবীহি সমাস ও উপপদ তৎপুরুষ সমাসের সমস্ত পদ প্রায় একই ধরনের হয়। ফলে এদের সমস্ত পদ দেখে আলাদা করে চেনার তেমন কোন উপায় নেই। এগুলোর সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাই একই ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর পরীক্ষায় মূলত এগুলো উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ হিসেবেই আসে।)

সমানাধিকরণ বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়।]

হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার
খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার
হতসর্বস্ব	হত হয়েছে সর্বস্ব যার
পীতাষ্঵র	পীত অষ্঵র যার
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার

ব্যাধিকরণ বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[যে বহুবীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনটিই বিশেষণ নয় তাকে ব্যাধিকরণ বহুবীহি বলে।]

আশীবিষ	আশীতে বিষ যার
দুকানকাটা	দুই কান কাটা যার
বোঁটাখসা	বোঁটা খসেছে যার
ছাপোষা	ছা পোষা যার
কথাসর্বস্ব	কথা সর্বস্ব যার

ব্যতিহার বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুবীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং পরপদে ‘ই’ যুক্ত হয়।]

লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে যুদ্ধ
কানাকানি	কানে কানে যে কথা
ব্যতিহার বহুবীহির উদাহরণ	চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, ওঁতাওঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি

নঞ্চ বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[বিশেষ পূর্বপদের আগে নঞ্চ অর্থাতঃ না বোধক অব্যয় যোগ করে যে বহুবীহি সমাস গঠন করা হয় তাকে নঞ্চ]

বহুবীহি সমাস বলে ।]

অজ্ঞান	নাই জ্ঞান যার	নাজানা	না (নয়) জানা যা
বেহেড়	নাই হেড যার	নির্ভুল	নি (নাই) ভুল যার
নাচার	না (নাই) চারা (উপায়) যার	বেওয়ারিশ	বে (নাই) ওয়ারিশ যার
নিঃশক্ত	নাই শক্ত যার	বেতার	বে (নাই) তার যার
নিষ্কলঙ্ক	নাই কলঙ্ক যার		

মধ্যপদলোপী বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[বহুবীহি সমাসের ব্যাসবাকে ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায় তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুবীহি সমাস বলে ।]

দশবছুরে	দশ বছর বয়স যার
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
বিড়ালচোরী	বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর

প্রত্যয়ান্ত বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

যে বহুবীহি সমাসের সমস্তপদে আ , এ , ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুবীহি সমাস

একচোখা	এক দিকে চোখ যার
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার
নি-খরচে	নি: খরচ যার
দোটানা	দুই দিকে টান যার

অলুক বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[যে বহুবীহি সমাসে বিভিন্ন কোনো পরিবর্তন হয়না তাকে অলুক বহুবীহি বলে ।]

মাথায়পাগড়ি	মাথায় পাগড়ি যার
গলায়গামছা	গলায় গামছা যার
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

সংখ্যাবাচক বহুবীহি সমাসের উদাহরণ

[পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বুকালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুবীহি বলে । এই সমাসে সমস্তপদে আ , ই বা সৌ যুক্ত হয়]

দশগজি	দশ গজ পরিমাণ যার
চৌচালা	চৌ চাল যে ঘরের
দশানন	দশ আনন যার
চারহাতি	চার হাত পরিমাণ যা
তেপায়া	তিন পা বিশিষ্ট যা

নিপাতনে সিদ্ধ বহুবীহি

দ্বীপ	দু দিকে অপ যার
নরপশু	নরাকারের পশু যে
জীবন্মৃত	জীবিত থেকেও যে মৃত

পদ্ধিতমূর্খ	পদ্ধিত হয়েও যে মূর্খ
অন্তরীপ	অন্তর্গত অপ যান

দ্বিগ্ন সমাস

দ্বিগ্ন সমাসের সঙ্গে কর্মধারয় সমাসের বেশ মিল রয়েছে। এজন্য একে অনেকেই কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। দ্বিগ্ন সমাসেও পরপদের অর্থই প্রধান। এবং এই সমাসেও বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয়। তবে এখানে বিশেষণ পদটি সর্বদাই সংখ্যাবাচক হয়, এবং সমাস হয় সমাহার বা মিলন অর্থে। অর্থাৎ, সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বিগ্ন সমাস বলে। যেমন, ‘অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু’। এখানে পূর্বপদ ‘অষ্ট’ একটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। আর পরপদ ‘ধাতু’ বিশেষ্য। অষ্ট ধাতুর মিলন বা সমাহার অর্থে সমাস হয়ে ‘অষ্টধাতু’ সমস্ত পদটি তৈরি হয়েছে যাতে ‘ধাতু’ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পরপদের অর্থ প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং, এটি দ্বিগ্ন সমাস।

দ্বিগ্ন সমাস

চতুরঙ্গ	চার অঙ্গের সমাহার	সম্পর্কি	সম্প্র ঋষির সমাহার
ত্রিপদী	ত্রি পদের সমাহার	ষড়ঘূর্ত	চ্যু ঘূর্তুর সমাহার
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	তেমাথা	তিন মাথার সমাহার
চৌরাষ্ট্রা	চৌ রাষ্ট্রার মিলন	অষ্টধাতু	অষ্ট ধাতুর সমাহার
তেমোহনা	তিন মোহনার মিলন	তেরনদী	তের নদীর সমাহার
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার	সাতসমুদ্র	সাত সমুদ্রের সমাহার
শতাদ্বী	শত অদ্বীর সমাহার	পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	পঞ্চভূত	পঞ্চ ভূতের সমাহার
ত্রিপদী	তিন পদের সমাহার	নবরঞ্জ	নয় রঞ্জের সমাহার
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার		

অব্যয়ীভাব সমাস

সমাসের পূর্বপদ হিসেবে যদি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়, এবং সেই অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়, তবে সেই সমাসকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস। যেমন, ‘মরণ পর্যন্ত = আমরণ’। এখানে পূর্বপদ হিসেবে পর্যন্ত অর্থে ‘আ’ উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরপদ ‘মরণ’। কিন্তু এখানে সমস্ত পদটিকে নতুন অর্থ দিয়েছে ‘আ’ উপসর্গটি। অর্থাৎ, এখানে ‘আ’ উপসর্গ বা অব্যয় বা পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাস। (উপসর্গ এক ধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশ। উপসর্গ বচন বা লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয় না কিংবা বাক্যের অন্য কোন পদের পরিবর্তনেও এর কোন পরিবর্তন হয় না। এরকম আরেকটি অব্যয়সূচক শব্দাংশ হলো অনুসর্গ।)

সামীপ্য বুৰূাতে	সাদৃশ্য বুৰূাতে		বীক্ষা বুৰূাতে	
উপকৰ্ত্তা	কর্তৃের সমীপে	উপভাষা	ভাষার সদৃশ	প্রতিগ্রহে
উপকূল	কূলের সমীপে	উপবন	বনের সদৃশ	প্রতিক্রিয়া/অনুক্রণ
উপনগরী	নগরীর সমীপে	উপগ্রহ	গ্রহের তুল্য	প্রতিদিন
অন্তিক্রম্যতা বুৰূাতে		অভাব বুৰূাতে		ঈষৎ বুৰূাতে
যথানিয়ম	নিয়মকে অতিক্রম না কৰে	নিরামিষ	আমিষের অভাব	আনত
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না কৰে	হাভাত	ভাতের অভাব	আরক্তিম
				ঈষৎ রাক্তিম

মথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	গরমিল	মিলের অভাব		
পর্যন্ত বুঝাতে		অতিক্রান্ত বুঝাতে		বিরুদ্ধ বুঝাতে	
আজীবন	জীবন পর্যন্ত	উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	প্রতিযোগ	বিরুদ্ধ যোগ
আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত	উচ্ছুল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	প্রতিবাদ	বিরুদ্ধ বাদ
আপাদমস্তক	পাদ হতে মস্তক পর্যন্ত	উচ্ছিন্ন	ছিন্নকে অতিক্রান্ত	প্রতিকূল	বিরুদ্ধ কূল

প্রাদি সমাস

প্র, প্রতি, অনু, পরি, ইত্যাদি অব্যয় বা উপসর্গের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সমাস হলে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন, প্র(প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এখানে বচন সমস্যমান পদটি একটি বিশেষ্য, যার মূল (ধাতু) বচ ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয়। ‘প্র’ অব্যয়ের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য ‘বচন’র সমাস হয়ে সমস্ত পদ ‘প্রবচন’ শব্দটি তৈরি হয়েছে। সুতরাং, এটি প্রাদি সমাস।

নিত্য সমাস

যে সমাসের সমস্ত পদই ব্যাসবাক্যের কাজ করে, আলাদা করে ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। এখানে ‘অন্য গ্রাম’ আর ‘গ্রামান্তর’, এই বাক্যাংশ ও শব্দটির মধ্যে তেমন বিশেষকোন পার্থক্য নেই। কেবল ‘অন্য’ পদের বদলে ‘অন্তর’ পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটি নিত্য সমাস।

প্রয়োগ-অপ্রয়োগ

এই অংশের প্রশ্ন কমন পেতে অনেকগুলো বিষয় জানা দরকার। নিচে তা এক এক করে আলোচনা করছি:

বাচ্য:

বাচ্য : বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে।

একটি বাক্যকে বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে। একেকভাবে লিখলে বাক্যটির মূল বক্তব্য একই থাকলেও,

একেকবার একেকটি উপাদান অধিক প্রাধান্য পায়। একটি বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকেই বলে বাচ্য।

বাংলা ভাষায় **৩টি** বাচ্য পাওয়া যায়- কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

বিভিন্ন ধরনের বাচ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে বাক্যের কর্তা ও কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার।

কর্তা : যেই পদ বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তা বলে। অর্থাৎ, যে বাক্যের কাজটি করে, সে-ই

কর্তা। যেমন- গরু ঘাস খায়। এখানে খাওয়ার কাজটি করছে ‘গরু’।- সুতরাং, এখানে ‘গরু’ কর্তা।

টেবিলটি সকাল থেকে এরকম নড়বড় করছে।- এখানে ‘নড়বড় করা’র কাজটি করছে ‘টেবিল’। সুতরাং,

এখানে কর্তা ‘টেবিল’।

ক্রিয়াকে ‘কে/কারা’ দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা পাওয়া যায়।

কর্ম : কর্তা যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম বলে। অর্থাৎ, কর্তা যার

সাহায্যে কাজটি করে, তাই কর্ম। যেমন- গরু ঘাস খায়।- এখানে ‘গরু’ ‘খাওয়া’র কাজটি করার জন্য

‘ঘাস’কে অবলম্বন হিসেবে নিয়েছে। সে ‘ঘাস’কে দিয়ে ‘খাওয়া’র কাজ করছে। সুতরাং, এখানে ‘ঘাস’ কর্ম।

বাবা আমাকে ল্যাপটপ কিনে দিয়েছেন।- এখানে ‘কিনে দেয়া’র কাজটি করেছেন ‘বাবা’। ‘বাবা’ এখানে কর্তা।

‘বাবা’ ‘কিনে দেয়া’র কাজ করার জন্য ‘আমাকে’ ও ‘ল্যাপটপ’-র সাহায্য নিয়েছেন। এখানে, ‘আমাকে’ ও

‘ল্যাপটপ’ কর্ম।

ক্ৰিয়াকে ‘কী/ কাকে’ দিয়ে প্ৰম্ভ কৱলে কৰ্তা পদ পাওয়া যায়।

কৰ্তৃবাচ্য : বাক্যে কৰ্তার প্ৰাধান্য রঞ্জিত হলে তাকে কৰ্তৃবাচ্য বলে। এ ধৰনেৰ বাক্যে কৰ্তা অনুযায়ী ক্ৰিয়াপদ ব্যবহৃত হয় এবং ক্ৰিয়া কৰ্তার অনুসাৰী হয়।

কৰ্তৃবাচ্যেৰ পদে কৰ্তায়- শূণ্য বিভক্তি হয়।

কৰ্মে- দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (শূণ্য বিভক্তিও হতে পাৰে)

যেমন- ছাত্ৰৰা বাংলা পড়ছে।

শিক্ষক ছাত্ৰদেৱ পড়ান।

কৰ্মবাচ্য : কৰ্মপদ প্ৰধান কৰ্মপদ হলে তাকে কৰ্মবাচ্য বলে। এ ধৰনেৰ বাক্যে ক্ৰিয়াপদ কৰ্তা অনুযায়ী না হয়ে কৰ্মপদ অনুযায়ী হয় এবং কৰ্মপদেৱ অনুসাৰী হয়।

এ ধৰনেৰ বাক্যে কৰ্তায়- তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কৰ্মে- শূণ্য বিভক্তি হয়। (কথনো কথনো দ্বিতীয়া বিভক্তিও হয়)

যেমন-

শিকারি কৰ্তৃক বাধ্যটি নিহত হয়েছে।

আসামিকে জৱিমানা কৱা হয়েছে। (কৰ্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি)

ভাববাচ্য : বাক্যে ক্ৰিয়াৰ অৰ্থই বিশেষভাৱে প্ৰকাশিত হলে তাকে ভাববাচ্য বলে। এ ধৰনেৰ বাক্যে কৰ্ম থাকে না এবং কৰ্তাও প্ৰধান হয় না। কাউকে কোন কিছু সৱাসিৱ না বলে ঘূৰিয়ে বলতে গেলে ভাববাচ্যে বলা যায়।

এ ধৰনেৰ বাক্যে কৰ্তায়- ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

নামপুৰুষেৱ ক্ৰিয়াপদ [ক্ৰিয়াপদ] হয়।

মাৰো মাৰো মূল ক্ৰিয়াপদেৱ সঙ্গে সহযোগী ক্ৰিয়াপদও যুক্ত হয়।

কথনো কথনো কৰ্তা উহু থাকে, অৰ্থাৎ কৰ্তা অনুলোভিত থাকে।

যেমন-

আমাৰ থাওয়া হল না। (নামপুৰুষেৱ ক্ৰিয়াপদ)

তোমাৰ যাওয়া হবে না। (নামপুৰুষেৱ ক্ৰিয়াপদ)

এ পথে চলা যায় না। (সহযোগী ক্ৰিয়াপদ যুক্ত)

কোথা থেকে আসা হচ্ছে। (সহযোগী ক্ৰিয়াপদ যুক্ত)

এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী কৱা চলে না। (কৰ্তা ‘তুমি’ উহু)

এ রাষ্টা আমাৰ চেনা নেই।

কৰ্মকৰ্তৃবাচ্য : এছাড়াও বাংলায় আৱো এক ধৰনেৰ প্ৰকাশভঙ্গিৰ বাক্য দেখা যায়। এ ধৰনেৰ বাক্যেৰ বাচ্যকে বলা হয় কৰ্মকৰ্তৃবাচ্য।

এ ধৰনেৰ বাক্যে কৰ্তাপদ উহু থাকে, তবে কৰ্মপদ থাকে। আৱ ওই কৰ্মপদই কৰ্তার কাজ কৱে। অৰ্থাৎ, যে বাক্যে কৰ্তা থাকে না, কমহি কৰ্তার কাজ কৱে, তাকে কৰ্মকৰ্তৃবাচ্য বলে। যেমন-

কাজটা ভাল দেখায় না।- এখানে কৰ্তা নেই। কৰ্ম হল ‘কাজ’। কিন্তু ‘কাজ’ নিজেই কৰ্তার মত বাক্যকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এৱকম-

বাঁশি বাজে এ মধুৰ লগনে।

সুতি কাপড় অনেক দিন টেকে।

বচন:

বচন: বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যার ধারণা প্রকাশের উপায় বা সংখ্যাত্ত্বক প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।
বচন ২ প্রকার- একবচন ও বহুবচন।

একবচন: যখন কোন শব্দ দ্বারা কেবল একটি ব্যক্তি, বস্তি বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে একবচন বলে। যেমন- ছেলেটা, গরুটা, কলমটা, ইত্যাদি।

বহুবচন: যখন কোন শব্দ দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, বস্তি বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে বহুবচন বলে।
যেমন- ছেলেগুলো, গরুগুলো, কলমগুলি, ইত্যাদি।

কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়। কখনোই বিশেষণ পদের বচনভেদ হয় না। কিন্তু কোন বিশেষণবাচক শব্দ যদি কোন বাক্যে বিশেষ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিশেষ পদ হয়, এবং কেবল তখনই তার বচনভেদ হয়।

বাংলায় বহুবচন বোঝানোর জন্য কতগুলো শব্দ বা শব্দাংশ (বিভক্তি) ব্যবহৃত হয়। এগুলোর অধিকাংশই এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। অর্থাৎ, বলা যায়, এগুলোর বেশিরভাগই তৎসম শব্দ বা শব্দাংশ। যেমন- রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের (শব্দাংশ বা বিভক্তি); সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি (শব্দ)।

বহুবচন বোধক শব্দাংশের ব্যবহার

১. রা/এরা: শুধু উল্লিখিত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা/এরা’ ব্যবহৃত হয়।
সোজা কথায়, বস্তিবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা/এরা’ যুক্ত হয়। যেমন- ছাত্ররা লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা লেখাপড়া করান। তারা সবাই লেখাপড়া করতে ভালোবাসে।

২. গুলা/গুলি/গুলো: বস্তি ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ‘গুলা/গুলি/গুলো’ যুক্ত হয়। যেমন- বানরগুলো দাঁত কেলাচ্ছে। **অতগুলো** আম কে থাবে? গুলিগুলো মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিলো।

বহুবচন বোধক শব্দের ব্যবহার

১. উল্লিখিত প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-
গণ- দেবগণ, নরগণ, জনগণ

বৃন্দ- সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ,

মন্ত্রলী- শিক্ষকমন্ত্রলী, সম্পাদকমন্ত্রলী

বর্গ- পন্ডিত বর্গ, মন্ত্রি বর্গ

২. বস্তি ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

কুল- পঞ্জিকুল, বৃক্ষকুল, (ব্যতিক্রম- কবিকুল, মাতৃকুল)

সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল

সব- ভাইসব, পাখিসব

সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ

৩. কেবল জন্মবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

পাল- গরুচর পাল

মূখ- পঞ্জিমূখ

৪. বস্তিবাচক বা অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

আবলি- পুষ্টকাবলি

গুচ্ছ- কবিতাগুচ্ছ

দাম- কুসুমদাম

নিকৱ- কমলনিকৱ

পুঁজি- মেঘপুঁজি

মালা- পর্বতমালা

রাজি- তারকারাজি

রাশি- বালিরাশি

নিচয়- কুসুমনিচয়

বহুবচনের বিশেষ প্রয়োগ

১. একবচন বোধক বিশেষ ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-
সিংহ বলে থাকে। (সব সিংহ বলে থাকে বোঝাচ্ছে।)

পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। (অনেক পোকার আক্রমণ বোঝাচ্ছে।)

বাজারে লোক জমেছে। (অনেক লোক জমেছে বোঝাচ্ছে।)

বাগানে ফুল ফুটেছে। (অনেক ফুল ফুটেছে বোঝাচ্ছে।)

২. একবচন বোধক বিশেষের আগে বহুব বোধক শব্দ, যেমন- অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, চের ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-

অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, চের খরচ, অতেল টাকা, ইত্যাদি।

৩. বিশেষ পদ বা তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিতীয় প্রয়োগে, অর্থাৎ পদটি পরপর দুইবার ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-

হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, লাল লাল ফুল, বড় বড় মার্ঠ।

৪. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন-

মেয়েরা কালাকানি করছে। ('মেয়েরা' বলতে এখানে নির্দিষ্ট কিছু মেয়েদের বোঝাচ্ছে, যারা কালাকানি করছে।)

এটাই করিমদের বাড়ি। ('করিমদের' বলতে এখানে করিমের পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে।)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিন জন্মায় না। ('রবীন্দ্রনাথের' বলতে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকদের বোঝানো হচ্ছে।) সকলে সব জানে না।

৫. কিছু বিদেশি শব্দে বাংলা ভাষার বহুবচনের পদ্ধতির পাশাপাশি বিদেশি ভাষার অনুকরণেও বহুবচন করা হয়ে থাকে। যেমন-

বুজুর্গ- বুজুর্গাইন

সাহেব- সাহেবান

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত। আর তাই এগুলো ব্যবহারের নিয়মও সংস্কৃত শব্দে বা তৎসম শব্দেই বেশি হয়। থাঁটি বাংলা শব্দে বা তত্ত্ব শব্দে এসব নিয়ম সাধারণত মানা হয় না। আর আধুনিক বাংলা ভাষার চলিত রীতিতেও এ সকল নিয়ম প্রায়ই মানা হয় না। তত্ত্ব শব্দের বহুবচনে ও আধুনিক চলিত রীতিতে বিশেষ ও সর্বনামের চলিত রীতিতে সহজ কয়েকটি শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল-

শব্দাংশ- রা, এরা, গুলা, গুলো, দের

শব্দ- অনেক, বহু, সব

সাবধানতা/ অশুক্রি সংশোধন : একই সঙ্গে একাধিক/ একটির বেশি বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- ‘সব মানুষেরা’ বললে তা ভুল হবে। বলতে হবে ‘সব মানুষ’ বা ‘মানুষেরা’। [অশুক্রি সংশোধন]

লিঙ্গ:

লিঙ্গ : ছেলে মেয়ের ধারণাকে বলা হয় লিঙ্গ। অর্থাৎ, পুঁলিঙ্গ মানে পুরুষ, আর স্ত্রীলিঙ্গ মানে নারী বা মেয়ে বা স্ত্রী। এই বিভাজনই হলো লিঙ্গভেদ। অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। আবার অনেক সময় দুই লিঙ্গের দুইটি পৃথক শব্দও ব্যবহৃত হয়।

পুরুষবাচক শব্দ : যে শব্দ পুরুষ বা ছেলে বোঝায়, তাকে পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমন- বাপ, ভাই, ছেলে, ইত্যাদি।

স্ত্রীবাচক শব্দ : যে শব্দ নারী বা স্ত্রী বা মেয়ে বোঝায়, তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন- মা, বোন, মেয়ে, ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, মূলত বিশেষ ও বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ আছে। সংস্কৃত ভাষায় পুরুষবাচক বিশেষ পদের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ পদ আর স্ত্রীবাচক বিশেষ পদের স্ত্রীবাচক বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই নিয়ম মানা হয় না। বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ করা হয় না। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ পদের লিঙ্গভেদ হয়। যেমন- সংস্কৃত ভাষায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা’। কিন্তু বাংলা ভাষায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা’।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দগুলোকে সাধারণত ২টি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ : আববা-আম্মা, বাবা-মা, চাচা-চাচি, কাকা-কাকি, জেঠা-জেঠি, দাদা-দাদি, নানা-নানি, নন্দাই-নন্দ, দেওর-জা, ভাই-ভাবি/বৌদি, ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ : খোকা-খুকি, পাগল-পাগলি, বামন-বামনি, ভেড়া-ভেড়ী, মোরগ-মুরগি, বালক-বালিকা, দেওর-নন্দ, ইত্যাদি।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

মূলত পুরুষবাচক শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। অর্থাৎ, পুরুষবাচক শব্দের শেষে একটি অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। এই স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ২ প্রকার- বাংলা স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ও সংস্কৃত স্ত্রী বাচক প্রত্যয়। বাংলা স্ত্রী বাচক প্রত্যয়গুলো বাংলা শব্দের সঙ্গে আর সংস্কৃত স্ত্রী বাচক প্রত্যয়গুলো সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হওয়া ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ নিয়মে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

নিচে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাংলা শব্দের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পুরুষ হতে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন :

১. ঈ-প্রত্যয় : বেঙ্গম-বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে- ভাগনী

২. নী-প্রত্যয় : কামার-কামারী, জেলে-জেলেৰী, কুমার-কুমারী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরী

পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘ঈ’ থাকলে নী-প্রত্যয় যোগ হলে আগের ‘ঈ’, ‘ই’ হয়। যেমন- ভিথারী- ভিথারিনী

৩. আনী-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী

8. ইন্দী-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়ালা- গোয়ালিনী, বাষ-বাষিনী
৫. উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরন
৬. আইন-প্রত্যয় : (এরকম আরো নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়) ঠাকুর-ঠাকুরাইন

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ : কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। অর্থাৎ, এগুলো সর্বদাই স্ত্রীবাচক, এগুলোর কোন পুরুষবাচক শব্দই নেই। যেমন- সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা, ইত্যাদি।

শব্দের আগে পৃথক শব্দ যোগ করে :

কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক শব্দ গঠনের জন্য নর, মদা, ইত্যাদি ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠনের জন্য স্ত্রী, মাদী, মাদা, ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যেমন- মর/ মদা/ ছলো বিড়াল- মেনি বিড়াল, মদা হাঁস- মাদী হাঁস, মদা ঘোড়া- মাদী ঘোড়া, পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে- মেয়েছেলে, পুরুষ কয়েদী- স্ত্রী/ মেয়ে কয়েদী, এঁড়ে বাচুর-বকনা বাচুর, বলদ গরু- গাই গরু

পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগে :

কিছু কিছু পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন- কবি-মহিলা কবি, ডাঙ্গার- মহিলা ডাঙ্গার, সভ্য- মহিলা সভ্য, কর্মী- মহিলা কর্মী, শিল্পী- মহিলা শিল্পী/ নারী শিল্পী, সৈন্য- নারী সৈন্য/ মহিলা সৈন্য, পুলিশ- মহিলা পুলিশ

শব্দের শেষে পৃথক শব্দ যোগ করে :

শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করেও পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন- বোন-পো- বোন-ঝি, ঠাকুর-পো- ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর দাদা/ ঠাকুরদা- ঠাকুরমা, গয়লা- গয়লা-বউ, জেলে- জেলে-বউ

ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে :

দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী বাচক বোঝানো যেতে পারে। যেমন- বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিল্লী, ছেলে-মেয়ে, সাহেব- বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলহা-দুলাইন/ দুলহিন, বেয়াই-বেয়াইন, তাত্রি-মাত্রি, বাদশা-বেগম, শুক-সারী

সংস্কৃত শব্দের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পুরুষ হতে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন :

১. আ-প্রত্যয় : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃক্ষ-বৃক্ষা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা, অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূদ্র-শূদ্রা

২. ঈ-প্রত্যয় : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, যোড়শ-যোড়শী, সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ুর-ময়ুরী

৩. ইকা-প্রত্যয় :

(ক) শব্দের শেষে অক থাকলে ইকা-প্রত্যয় যোগ হয় এবং অক'-র স্থলে ইকা হয়। যেমন- বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা।

ব্যতিক্রম : গণক-গণকী (গণিকা- বেশ্যা), নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রজক-রজকী/ রজকিনী (বাংলায়)

(খ) অনেক সময় ক্ষুদ্রার্থেও ইকা প্রত্যয় যোগ হয়। তখন সেটা আর স্ত্রী প্রত্যয় থাকে না, এগুলো ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়। যেমন- নাটক-নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক, নাটকের স্ত্রী ক্রপ নয়), মালা-মালিকা (ক্ষুদ্র মালা), গীত-গীতিকা (ক্ষুদ্র গান), পুস্তক-পুস্তিকা (ক্ষুদ্র বই)।

৪. আলী-প্রত্যয় : ইন্দ্র-ইন্দ্রালী, মাতুল-মাতুলালী, আচার্য-আচার্যালী (আচার্যের স্ত্রী, কিন্তু আচার্যের কাজে

নিয়োজিত নারীও ‘আচার্য’), শূদ্র-শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী, সাধারণ শূদ্র জাতীয় মহিলা ‘শূদ্রা’), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, ক্ষত্রিয় জাতের মহিলা ক্ষত্রিয়া)

কথনো কথনো আনী-প্রত্যয় অর্থেরও পরিবর্তন ঘটায়। তখন সেটা আর স্ত্রী প্রত্যয় থাকে না। যেমন-
অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. নী, সীনী-প্রত্যয় : মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী

বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ :

১. যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ আছে, এগুলোর শেষে ‘ত্রী’ হয়। যেমন- ধাতা-ধাত্রী, নেতা-নেত্রী,
কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা- শ্রোত্রী

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বাল, মান, ঈয়ান থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়।
যেমন- সৎ-সতী, মহৎ-মহত্তী, গুণবান-গুণবত্তী, ক্লপবান-ক্লপবত্তী, শ্রীমান-শ্রীমতি, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমত্তী, গরীয়ান-
গরিয়সী

৩. বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ : সম্মাট- সম্মাঞ্জী, রাজা-রাণী, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শ্বশু, নর-নারী, বন্ধু-
বান্ধবী, দেবর- জা, শিক্ষক- শিক্ষিয়ত্রী, স্বামী-স্বী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ :

কতগুলো সংস্কৃত শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। অর্থাৎ, এগুলো সর্বদাই স্ত্রীবাচক, এগুলোর কোন পুরুষবাচক শব্দই নেই।
যেমন- সতীন, সৎমাতা, সধবা, কুলটা ইত্যাদি।

বিদেশি পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

খান- খানম

মরদ- জেনানা

মালেক- মালেকা

মুহতারিম- মুহতারিমা

সুলতান- সুলতানা

দ্রষ্টব্য :

১. কতোগুলো বাংলা শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী দুই-ই বোঝায়। যেমন- জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, শুল্ক

২. কতোগুলো শব্দ শুধু পুরুষ বোঝায়। যেমন- কবিবাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার

৩. কতোগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন- সতীন, সৎমা, সধবা

৪. কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ আছে-

দেবর- নন্দ (দেববের বোন), জা (দেবরের স্ত্রী)

ভাই- বোন, ভাবি/ বৌদি (ভাইয়ের স্ত্রী)

শিক্ষক- শিক্ষিয়ত্রী (নারী শিক্ষক), শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী)

বন্ধু- বান্ধবী মেয়ে বন্ধু), বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী)

দাদা-দিদি (বড় বোন), বৌদি (দাদার স্ত্রী)

৫. বাংলায় বিশেষণ পদের স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- সুন্দর বলদ- সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে- সুন্দর
মেয়ে, মেজ খুড়ো, মেজ খুড়ি

৬. বাংলায় বিশেষণ পদের স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলি হবে না)। নদী
ভয়ে অস্থির হয়ে গেছে (অস্থিরা হবে না)।

৭. কুল-উপাধি-বংশ ইত্যাদিরও স্ত্রীবাচক ক্লপ আছে। যেমন- ঘোষ- ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া
(পত্নী অর্থে)

বিৱাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন

বিৱাম চিহ্ন : বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য বাক্য উচ্চারণের সময় বাক্যের মাঝে ও শেষে বিৱতি দিতে হয়। এই বিৱতিৰ পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী কম-বেশি হয়ে থাকে। আবার বাক্য উচ্চারণের সময় বিভিন্ন আবেগের জন্য উচ্চারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। বাক্যটি লেখার সময় এই বিৱতি ও আবেগের ভিন্নতা প্রকাশ করার জন্য যেই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে বিৱাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন বা ছেদ চিহ্ন বলে।

প্রাচীন বাংলায় মাত্র দুইটি বিৱাম চিহ্ন ব্যবহার করা হতো, দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥)। পৱিত্রতাতে ঔশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষার অনুকরণে বাংলায় আরো অনেকগুলো বিৱাম চিহ্ন প্রচলন করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত বিৱাম চিহ্নগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিৱাম চিহ্ন নিচে দেয়া হলো-

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিৱতিৰ পরিমাণ
কমা	,	১ বলতে যে সময় লাগে
দাঁড়ি/ পূর্ণছেদ	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিষয়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
কোলন	:	এক সেকেন্ড
সেমি কোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
উদ্ধৃণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন	‘ ’/ “ ”	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	,	থামার প্রয়োজন নেই
বন্ধনী চিহ্ন	() { } []	থামার প্রয়োজন নেই
দুই দাঁড়ি	॥	
ত্রিবিন্দু বা ত্রিডট	...	

বিৱাম চিহ্নের ব্যবহার:

কমা (,)

- বাক্য সুস্পষ্ট করতে বাক্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগে করে প্রতিটি ভাগের মাঝে কমা বসে। যেমনসুখ চাও -, সুখ পাবে বই পড়ো।
- পৰম্পৰ সম্পর্কিত একাধিক বিশেষ বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে ব্যবহৃত হলে শেষ পদটি ছাড়া প্রতিটিৰ পৱে কমা বসে। যেমনডিমেষ্বৰ আমাদেৱ মন সুখ ১৬ -, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালবাসা, আনন্দে ভৱে থাকে।
- সম্বোধনেৱ পৱে কমা বসে। যেমনৱশিদ -, এদিকে এসো।
- জটিল বাক্যেৱ প্রত্যেকটি খন্দবাক্যেৱ পৱে কমা বসে। যেমনযে পরিশ্ৰম কৱে -, সেই সুখ লাভ কৱে।

- কোন বাক্যে উদ্ভৃতি থাকলে, তার আগের থ্রেডবাক্যের শেষে কমা (,) বসে। যেমন- আহমদ ছফা বলেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' তুমি বললে, 'আমি কালকে আবার আসবো।'
- মাসের তারিখ লেখার সময় বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমনবৈশাখ ২৫-, ১৪১৮, বুধবার।
- ঠিকানা লেখার সময় বাড়ির নাম্বার বা রাস্তার নামের পর কমা বসে। যেমন৬৮-, নবাবপুর রোড, ঢাকা - ১০০০
- ডিগ্রী পদবি লেখার সময় কমা ব্যবহৃত হয়। যেমনডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক -, এম.এ, পিএইচ-ডি।

সেমিকোলন (;)

কমা-র চেয়ে বেশি কিন্তু দাঁড়ি-র চেয়ে কম বিরতি দেয়ার জন্য সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন- আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি; আসলেই কি সবাই ভালবাসি?

- এক ধরনের বাক্যগত চিহ্ন
- একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে
- বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য সমজাতীয় বাক্য পশাপাশি প্রতিস্থাপন করলে সেমিকোলন বসে

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

প্রতিটি বাক্যের[] শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি দিয়ে বাক্যটি শেষ হয়েছে বোঝায়। যেমন- তুমি কেমন আছ?

বিস্ময়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন (।)

বিস্মিত হওয়ার অনুভূতি প্রকাশের জন্য কিংবা অন্য কোন হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-

আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।

ছি! তুমি এত খারাপ।

হুরুরে! আমরা খেলায় জিতেছি।

আগে সম্মোধনের পরেও বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আধুনিক নিয়ম অনুযায়ী সম্মোধনের পরে কমা বসে। তাই পুরোনো লেখায় সম্মোধনের পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকলেও এখন এটা আর লেখা হয় না। যেমন-

জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্য লিখতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন- সভায় ঠিক করা হল : এক মাস পর আবার সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাস (-)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে দুই বা তারচেয়েও বেশি পৃথক বাক্য লেখার সময় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যেমন-

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে।

- কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়
- বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন বসে
- গল্পে উপন্যাসে প্রসঙ্গের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায় ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়

- নাটক বা গল্পউপন্যাসে সংলাপের আগেও ড্যাশ চিহ্ন বসে-

কোলন ড্যাস (:-)

উদাহরণ বা দৃষ্টিগোপনের জন্য কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন-
পদ পাঁচ প্রকার :- বিশেষ, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, দুইটি পদ একসঙ্গে
লিখতে গেলে হাইফেন দিয়ে লিখতে হয়। যেমন-
সুখ-দুঃখ, মা-বাবা।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন

কোন বর্ণ লোপ করে বা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কবিতা বা
অন্যান্য সাহিত্যে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-
মাথার 'পরে জ্বলছে রবি। ('পরে= ওপরে)
পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা = কাহারা)

উদ্বৃত্ত চিহ্ন

বক্তার কথা হ্রুহু উদ্বৃত্ত করলে সেটিকে এই চিহ্নের মধ্যে রাখতে হয়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের
মধ্যে রেখে লিখতে হয়। যেমন-
ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, 'জন্মভূমি অথবা মৃত্যু'।

ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ().{ }. []

গণিতশাস্ত্রে এই তিনটির আলাদা গুরুত্ব থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে এদের আলাদা কোন গুরুত্ব নেই। তবে
সাহিত্যে ও রচনায় ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করা হয়। যেমন-
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) পাকিস্তান
বাংলাদেশের কাছে প্রারজয় মেনে দলিলে স্বাক্ষর করে।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিরাম চিহ্নের বাইরেও বাংলা ভাষায় কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলো দিয়ে কোন বিরতি বা ছেদ বোঝানো
হয় না। এগুলো ব্যাকরণের ক্ষেত্রে টার্মস বোঝায়।

ব্যাকরণের বিভিন্ন তথ্য বা টার্মস বোঝাতে যেই চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই ব্যাকরণিক চিহ্ন।
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাকরণিক চিহ্ন হলো-

বোঝায়	চিহ্ন/ আকৃতি	উদাহরণ
ধাতু	√	√স্থা = স্থা ধাতু
প্রবর্তী শব্দ হতে উৎপন্ন	<	জাঁদরেল < জেনারেল
পূর্ববর্তী শব্দ হতে উৎপন্ন	>	গঙ্গা > গাঁও
সমানবাচক বা সমস্তবাচক	=	নর ও নারী = নরনারী

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com